না। গেল বারে আমার বিয়ে রুকবে বোলে শালারা ভলেন্টিয়ারের দল পর্য্যন্ত খুলেছিল; শেষকালে কি কপাল ফাটিয়ে বাড়ী ফিরতে হ'বে?'

টিকটিকির কাটা লেজের মত লাফাইতে লাফাইতে ঘটক হুঙ্কার করিয়া বলিয়াছিল—'কী! মাথা ফাটাবে? কোম্পানির রাজত্ব উঠে গেছে বটে? আপনি নেবে যান আসরে দাদা—এবারে ধুর্জ্জটি বাম্‌না রোয়েচে মনে রাখবেন। নিয়ে আসুক বেটারা কত ভলেন্টিয়ার নিয়ে আসবে, আমিও ভু-ভারতের যত ঘটক-পুরুৎ একত্তোর কোরচি। আবার একটা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের ব্যাপার হোয়ে যাক্—হেঁ—হেঁ।'

চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাকে অনেক কষ্টে ঠাণ্ডা করিয়া বলিয়াছিলেন—'তা হোলে নেহাৎ যখন বোলচ, তবে দেখ দিন ছয় সাতের মধ্যে যদি ঠিক কোরতে পার। বিয়ের লগ্নের জন্তে অতটা ভেব না; শুধু দেখ যেন বাড়ী থেকে যাত্রা করবার সময়টা ভাল থাকে।'

এই প্রকার আশা-আশঙ্কায় দিনগুলা কাটিয়া যাইতেছিল—তবে আশার চেয়ে আশঙ্কার ভাগটা দিন দিন যেন বাড়িয়াই উঠিতেছিল বলিয়া বোধ হয়। বিবাহ-যজ্ঞের পরিপন্থী দৈত্যদানবগুলিকে তৃপ্ত করিবার জন্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় জন্মতিথি উপলক্ষ্য করিয়া একটা প্রীতি-ভোজের পর্য্যন্ত আয়োজন করিলেন। সমস্ত ভার দিলেন মহীতোষের উপর। কিন্তু তাহাতেও যুবকদের আড়ালে ফিস্‌ফিসানি এবং সামনে দৃষ্টিবিনিময় ও ঠোঁটের কোণের কুটিল হাসির যেরূপ বাড়াবাড়ি দেখা গেল তাহাতে বেশ বোঝা গেল—ব্যাপার বড় গুরুতর!

বটে!—চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাগিলেন। ঘুষি পাকাইয়া মনে মনে হিন্দি ভাষায় বলিলেন—'কুচ পরোয়া নেহি, আলবৎ বিয়ে করেঙ্গা; দেখি কে কি করে।—পরদিনই বিকালে পাড়ার সমাজ তথা যুবকবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাস্বরূপ ফরাসডাঙ্গার নরুণপেড়ে ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবী এবং বাদামী রং-এর সেলিম-সু পরিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্ত পাড়াটা টহল দিয়া আসিলেন। বাড়ীতে আসিয়া সাত বছরের মেয়েটিকে কোলে লইয়া বলিলেন—'মা'র জন্তে বড় মন কেমন করে—না রে ফেলি?'

মেয়েটি বাপের আদর বড় একটা পায় না আজকাল; ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—'হুঁ। বাবা, কবে আসবেন তিনি?—সবাই বড় বকে।'

সেটিকে কোল হইতে নামাইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বুক চিতাইয়া ঘরে পায়চারি করিতে করিতে অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন—'বিয়ে কোরব না বোললেই হোল? বিয়ে না করবার আমি কে?—এই দুগ্ধপোষ্য মেয়েটার প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে তো?—পিসী?—ওঃ—মা আর পিসীতে ঢের তফাৎ—আকাশ পাতাল! কৈ, বললে না তো—'না বাবা, পিসীমা খুব আদর করে, মাকে আর এনে কাজ নেই!' না চোরের ওপর রাগ ক'রে মাটিতে ভাত খাওয়া কিছু নয়। আজকাল উঠতে বসতে moral sanction-এর ধুয়ো উঠেচে। কেন রে বাপু—এই তো এত বড় moral sanction পেয়েছ আমার—আর কি চাস্?'

বাল্য-বিবাহ-রোধিনী সভার জরুরী মিটিং বসিয়াছে। কয়েক দিন সভার কার্য্য ঠিক মত না হওয়ায় কতকগুলা প্রস্তাব জমিয়া উঠিয়াছে। তাহা ভিন্ন কতকগুলি আবশ্যকীয় নূতন প্রস্তাবও উত্থাপিত হইবে এরূপ নোটিশ্ পাওয়া গিয়াছে, সভার বিজ্ঞাপনের নীচে লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া লেখা ছিল,—'দয়া করিয়া কেহ যেন বাজে তর্ক তুলিয়া সভার অমূল্য সময় নষ্ট না করেন।'

সভাপতি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সন্ধ্যা আহ্নিক এখনও শেষ হয় নাই; সকলে তাঁহারই জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। কয়েক জন একখানা মাসিক পত্রের 'মন্দিরের পথে' নামক আদিরসাত্মক একখানা নারী-চিত্রের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। কেব্‌লা গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিয়াছে—'আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি'—আর সতীনাথ চিৎ হইয়া বাম হস্তে সিগারেট টানিতে টানিতে ডান হস্তে চৌকির উপর কাওয়ালী বাজাইয়া যাইতেছে। মহীতোষ ক্রমাগত ঘড়ির দিকে চাহিতেছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মেয়েটিকে দেখিতে পাঠাইয়াছিল—বাবার কত দেরী; সে আসিয়া খবর দিল—কাপড় চোপড় ছাড়ছেন, একটু সময় নেবে; আপনাদের সুরু কোরে দিতে বোললেন।

ফেলারাম মহীতোষের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, 'তা হোলে গ্রীনরুমে ঢুকেচেন!'

সভার সেক্রেটারি টেবিলে দুইটি চাপড় দিয়া বলিল—'তাহোলে আমাদের সুরু কোরে দেওয়াই ভাল; চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এখনও একটু দেরী আছে। আজ 'এজেণ্ডা' একটু ভারী—সময় নেবে। মহীতোষ বাবু ততক্ষণ সভাপতির আসন অলং—

নেপালচন্দ্র কোণে একটা বাঙ্গলা দৈনিক পড়িতেছিল; কাগজটা রাখিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল,—'ওঃ সর্ব্বনাশ হোয়ে গেছে একেবারে!'

সকলে বিস্মিত ভাবে তাহার পানে চাহিল। নেপাল বলিল—'নোয়াখালির ওপর দিয়ে একটা মস্ত বড় সাইক্লোন পাস্ কোরে গেছে—প্রায় সাতখানা গ্রাম উড়িয়ে নিয়ে গেছে!'

কেহ বলিল—'এ আর নূতন কথা কি?—ওখানে দিনে পাঁচটা কোরে ওরকম সাইক্লোন বইছে।' কেহ বলিল—'এ সব জেনে-শুনেও লোকে বাড়ী করে ওখানে?' কেহ বা দয়া পরবশ হইয়া বলিল—'একটা রিলিফ ফণ্ড start করা উচিত।' গজানন পলিটিক্স লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করে, বলিল—'যদ্দিন ফরেন গবর্ণমেণ্ট আছে—'

হারাধন সতীনাথের পানে চাহিয়াছিল। সতীনাথ কিছু একটা না বলিলে সে প্রায় কোন বিষয়ে মত দেয় না, কারণ তাহার নিয়ম হইতেছে সতীনাথ যাহা বলিবে ঠিক তাহার উল্টা অভিমত দিয়া আরম্ভ করা।

সতীনাথ বলিল—'বোধ হয় ছাপবার ভুল আছে—সাতখানা গ্রাম না হোয়ে ঘর হোলে বিশ্বাস করতে রাজি আছি।'

হারাধন বলিল—'সতীনাথ বাবু বিশ্বাস কোরবেন না জানলে বোধ হয় ঝড়টা একটু বুঝে সুঝে কাজ কোরত; বেচারার মেহনতই সার হোল!'

সতীনাথ বলিল—'না, তা কেন হারাধন বাবু? সব কথা নির্ব্বিবাদে মেনে নিতে পারে এমন বর্ব্বরদের তো সমাজে অভাব নেই।'

একজন বলিল—'সাবাস!'

ঘরের এক দিকে বেঞ্চির উপর কয়েকজন বসিয়াছিল, তাহারা আসিয়া চৌকীর উপর ভিড় করিয়া বসিল।

নেপাল গলা চড়াইয়া বলিল—'সতে, বর্ব্বর বোলে বললি কাকে র‍্যা?—খুব কি সভ্যতার পরিচয় দেওয়া হোল? এই তো আমি বিশ্বাস কোরছি।—এর চেয়ে, ভদ্রলোক হো'য়ে কেউ এমন-একটা গালাগালি দিয়ে বোসতে পারে, এইটেই বিশ্বাস করা বেশী শক্ত বোলে মনে হয়!'

ঘরটা সরগরম হইয়া উঠিল। একজন বলিল—'Apology চাওয়া উচিত।'

আড়াল হইতে অপর একজন বলিল—'ঘাড় ধোরে apology চাওয়াও।'

গজানন বলিল—'বলবেই তো 'বর্ব্বর'; অতি-বিশ্বাসে দেশটা অধঃপাতে গেল।'

গিরিজা মোক্তারী পড়ে, সে আঙ্গুলের পর্ব্ব গুণিয়া বলিল—'তা হোলে আর বর্ব্বর হোতে বাকি রইল কে?—যে খবরটা পাঠিয়েছে সে বর্ব্বর, খবরের কাগজের editor বর্ব্বর, চাকরীর ভয়ে বেচারা printer ছেপেছে,—সে বর্ব্বর—'

ফেলারাম বলিল—'চলুগ্, চলুগ্; খুব সেশন মোকর্দ্দমা চালাচ্ছিস্ গিরজে!'

একজন উৎসাহী নূতন মেম্বর আপশোষ করিয়া করুণ সুরে বলিল—'কি সভার বিশেষ অধিবেশনের চেহারা!—' কিন্তু তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না।

সতীনাথ কখনও মেজাজ হারাইত না, সে খুব শান্তভাবে বলিল—'আচ্ছা, বর্ব্বর যাঁকে বোললাম তিনি তো চুপ কোরে মেনে নিলেন কথাটা; আর সবার এত মাথা ব্যথা কেন?'—বলিয়া একবার চকিতে হারাধনের পানে চাহিল।

হারাধন এতক্ষণ মনে মনে প্রথম আক্রমণের একটা লাগসই উত্তর হাতড়াইতেছিল;—তাহা তো পাইলই না, তাহার উপর এই দ্বিতীয় চোট!—সে কথা কহিল না। চৌকির একদিকে নোয়াখালির রামেন্দ্রচন্দ্র বসিয়াছিল, সে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া গিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া টানিতে টানিতে মাঝখানে বসাইয়া বলিল—'বলুন রামেন্দ্র বাবু, আপনাদের তো দেশ, বলুন শপথ কোরে

আপনাদের দেশে এ রকম ঝড় ওঠে কিনা। আজ হোয়ে যাক্ একটা হেস্তনেস্ত।'—বলিয়া পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটাইতে লাগিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাত বছরের মেয়েটি দুয়ারে ঠেস্ দিয়া তামাসা দেখিতেছিল, উর্দ্ধশ্বাসে ভিতরে ছুটিয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল— 'ও বাবা, ছুট্টে এসো, সুরু হোয়ে গেছে—এইবার হাত গুটুচ্চে।

'যত সব লক্ষ্মীছাড়াদের নিয়ে পোড়েছি, বাড়ীতে যেন ডাকাত-পড়া লাগিয়েছে। একবার শুভ কার্য্যটা হোয়ে গেলে আপদগুলোকে আর চৌকাঠ মাড়াতে দেব না। আবার দেখি, সে ব্যাটা কি এঁচে এসেচে। ঘটকাকে বোললাম ও মেয়েয় কাজ নেই—তা—' এই সব বলিতে বলিতে নিতান্ত বিরক্ত ভাবে বাহিরের দুয়ার পর্য্যন্ত আসিয়া একেবারে প্রসন্ন মুখে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, বলিলেন—'আজ আবার কি নিয়ে?'

ফেলারাম সংক্ষেপে বলিল—'নোয়াখালির ঝড়।'

'নাঃ, তোমাদের সব ছেলেমানুষী, এ রকম কোরে কি কাজ এগোয়? কোথায় নোয়াখালিতে তুচ্ছ একটা ঝড় উঠেছে—'

কেবল বলিল—নেহাৎ তুচ্ছ নয় ঠাকুদ্দা। নোয়াখালি তো জন শূন্য হোয়েইছে, সেখানকার রামেন্দ্র বাবু কলকাতায় এসে কোন রকমে প্রাণটা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, একটা ঝাপটা এসে তাঁকেও একটা আছাড় দিয়েছে।

নেপাল উঠিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সামনে আসিয়া বলিল —'এই তো চকোত্তী মশায়, আপনিই বলুন না—আপনার তো এই পঞ্চাশ ষাট বছর বয়েস হোল—ঝড়ে গোটা সাতেক গ্রাম উড়ে যাওয়া কি এতই অসম্ভব?'

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, 'পঞ্চাশ হোলে কত কি দেখব রে দাদা, কিন্তু তার তো এখনও দেরী আছে। এই ধর না কেন, চোদ্দ বছরে এন্ট্রেন্স পাশ করি—দু'বছর পরে বাপ মারা যান্—এই হোল ষোল—চাকরী জোটে ঝাড়া তিনটি বছর উমেদারি করবার পর—তাহলে হোল—'

ঘরটা হঠাৎ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। মেম্বরদের মধ্যে শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে কানাকানি চোখোচোখির ধুম পড়িয়া গিয়াছে লক্ষ্য করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটু থতমত খাইয়া ফড়াৎ ফড়াৎ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন; এবং ফেলারাম যদিও 'ঠাকুদ্দার কিসের বয়েস' বলিয়া উৎসাহ দিবার চেষ্টা করিল, তিনি বিশেষ উৎসাহ পাইলেন বলিয়া বোধ হইল না।—বলিলেন, 'বয়েস হবে না কেন রে দাদা, হোয়েছে: ঝড়ও অনেক দেখেছি,—তবে সে সব কথা সভায় কেন? আজকের এজেণ্ডা কি?—আমার আবার এক জায়গায় বরাৎ আছে রাত্তির আটটার সময়।

সতীনাথ ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল—'তা হোলে সাড়ে সাত তো প্রায় বাজে। নাও হে সেক্রেটারি, গত মিটিং-এর প্রোসিডিংস্-গুলো কন্‌ফারম্ কোরে নাও; তারপরে—'

ফেলারাম বলিল—'তাতে তো শুধু ময়াল সাপের লম্বাই আর সেই উড়েটার মটর চাপা পড়া নিয়ে তর্ক হোয়েছিল,— সে সব আর বাল্যবিবাহ-রোধিনীর খাতায় তু'লে কি হবে? তার চেয়ে মহীতোষ বাবু, আপনার কি সব প্রস্তাব আছে বোলে ফেলুন।'

'সেই তেতাল্লিশ বছরের ক'নের ব্যাপারটা?—মহীতোষ বাবু তোমাদের দ্বিতীয় মনু বলতে হবে'—বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটু কাষ্ঠহাসি হাসিবার চেষ্টা করিলেন। 'তা বেশ, সব টপটপ পাশ করে দাও; আমি—'হুঁ—

চা আসিতে লাগিল। এটি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নূতন বন্দোবস্ত, ঘটকের পরামর্শে জারি হইয়াছে।

মহীতোষ কাপ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল? 'আগে উপেন বাবুর প্রস্তাবটা পাশ হোয়ে থাক্ না; তাহোলে আমার ও প্রস্তাবটা নাও দরকার হোতে পারে'—বলিয়া উপেন্দ্রের পানে চাহিল।

উপেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রস্তাব করিল, 'যেহেতু বাঙ্গলা দেশে বিধবা বিবাহের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়, এই সভা ধার্য্য করিতেছে যে, যাঁহারা বিপত্নীক হইবার পর পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা বিধবা ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবেন না।'

যাহারা মহীতোষের জোটে ছিল তাহারা একবার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পানে আড়ে চাহিয়া লইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন—'বাঃ, এ তো চমৎকার ব্যবস্থা। আমি বলি

মহীতোষ বাবুরও সেই তেতাল্লিশ বৎসরের ক'নের প্রস্তাবটা এর সঙ্গে মিলিয়ে দাও না, আর ছেড়ে কি হ'বে ?'

হারাধন বাঙ্গলা দৈনিকটা একমনে পড়িতেছিল ; বলিয়া উঠিল—'সাতটা কেন, এই তো স্পষ্ট লেখা রয়েচে—'ঝড়েরটা গ্রাম উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে'—'এক'টা সে রকম ভাল কো'রে লাগে নি। এই নিন্—এইবার কি বলবেন বলুন'—বলিয়া কাগজটা সীতানাথের গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন—'আবার তো ঝড় উঠল, আমি তা হোলে উঠি, অনেকটা যেতে হ'বে। তোমরা যা' করবার ঠিক কে'রে নাও।'

উপেন বলিল, 'একটু বসুন, মহীতোষ বাবু কি নেমন্তন্নর কথা বো'লছিলেন ; তা'তে আপনার মত বিশেষ দরকার। কৈ, মহীতোষ বাবু ?'

মহীতোষ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—'আমার সানুনয় অনুরোধ এই যে, সভার পরের বৈঠক আগামী রবিবার আমাদের গ্রামে হয়। এইরূপ ভাবে দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়ে মাঝে মাঝে সভা ক'রবার যে কত উপকারিতা তা' আর আপনাদের বোধ হয় বোঝাতে হবে না। আমাদের গ্রামের সকলেই আমার মুখে সভার উদ্দেশ্য আর কার্য্যাবলীর কথা শুনে বড় আগ্রহ প্রকাশ কো'রছেন ; বৈঠকের জন্য বাড়ী পর্য্যন্ত আমি ঠিক কো'রে এসেছি। আর, যেহেতু এটা সভার প্রথম বাইরে যাওয়া, আমি সমস্ত ভার বহন করছি। এখন সভাপতি মহাশয়ের আর আপনাদের দয়া কো'রে মত দেওয়া।'

ঘরের অমন কড়া বিদ্যুতের আলো চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চোখে ধাঁধাঁ করিয়া যেন ধোঁয়াটে হইয়া গেল। তিনি যেন অনেক দূর হইতে অস্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন, 'বাঃ চমৎকার আইডিয়া'—ধন্যবাদ মহীতোষ বাবু—'চক্কত্তী মশায় তো আগে রাজি হবেন—থ্রি চিয়ার্স ফর মিষ্টার মহীতোষ রায়—'

মাথাটা আবার ঠিক হইলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, 'আমায় তা হোলে ছাড়ান্ দাও। আর কিছু নয়—তবে পরের বাড়ী গিয়ে হল্লা করা—বিদেশে—'

মহীতোষ বিনীত ভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, 'সে-সব কিছু ভাবতে হ'বে না। আমার এক বিধবা মাসীর বাড়ী। তিনটি প্রাণী তাঁরা—আমাদের বাড়ী গিয়েই থাকবেন। বাড়ীটাও গ্রামের একটু এক টেরেয়। পাড়ার ছেলেরা বড় উৎসাহ কো'রে সাজাবার ভার নিয়েছে। বলে—'মহীদা, সাজাব এমন যে রায়চৌধুরীদের বিয়ে বাড়ীর জলুসও হার মানবে…'

চক্রবর্ত্তী মহাশয় দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন—'তা' বেশ, তবে আমায় নিয়ে এই বুড়ো বয়সে টানাটানি করা কেন—তোমরাই চালিয়ে চুলিয়ে নিও।

ফেলারাম 'কিসের বিয়ে—' বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভাব দেখিয়া থামিয়া গেল।

মহীতোষ বলিল—'হাঁ, আর একটা কথা ;—যদিও রবিবারেই আপাততঃ ঠিক রইল, তা হোলেও পাকাপাকি ভাবে সভার দিনটা দু'দিন পরে বোলব। একটু আয়োজন টায়োজন কোরতে হবে তো।'

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিলেন—'ওঃ, বড় দেরী হোয়ে গেল।' বাহিরে আসিয়া হাঁকিয়া বলিলেন, —'ওরে দোর টোর সব বন্ধ কো'রে যা ; আমি একটু বাইরে চললাম।'

* * *

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বরাৎ ছিল ডেবোর ধারে ;—একটা সুপুরি গাছ নির্দ্দিষ্ট করা আছে, সেখানে ঘটক আসিবে। বাড়ীতে আসা নিরাপদ নয় বলিয়া কয়েক দিন ধরিয়া এই রকম বন্দোবস্তই চলিতেছে।

ঘটক সব শুনিয়া বলিল—'ইস্, বেটা ভারি মতলববাজ তো! আচ্ছা থাক রবিবার, আমি বিয়ের দিন বদলে দিচ্ছি।'

'সেও হাতে রেখে বলেছে, রবিবার পাকাপাকি করে নি। তুমিও যেদিন দিন ঠিক কোরবে—সেও ঠিক সেইদিন দলবল উঠিয়ে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে আর হ্যাঙ্গামে কাজ নেই—আর বয়সও হোল তো—চোদ্ '

'ঐঃ, বয়েস বাড়িয়ে বলা তোমার কেমন একটা রোগ

দাঁড়িয়ে গেছে, দাদা। চল্লিশ আবার একটা বয়েস?—ও বয়েসে সাহেবদের তো দুধের দাঁতও ভাঙে না।'

'কে জানে, তোমারও কেমন জিদ্ ধরে গেছে; যা ভাল বোঝ কর। তবে ওখানে অসম্ভব। সব বেটা যেন ভেতরে ভেতরে জেনে গিয়ে একটা মতলব আঁটছে বলে বোধ হোল।'

'কেন ব্রহ্মাণ্ডে আর মেয়ে নেই? ক' গণ্ডা চান আপনি?—বলিয়া ঘটক একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর নিতান্ত কুন্ঠিতভাবে একটু হাসিয়া বলিল—'বোলতে সাহস করি নি দাদা, এই সেদিন গিয়ে লক্ষ্য কোরলাম—মেয়েটির অঙ্গে একটু দোষও ছিল।

'কি রকম?'

যাক্ সে কথা, ও না হোয়েছে ভালই হোয়েছে। ছোঁড়ার ব্যাপার দেখে মনস্থির ছিল না, কাজেই মাগীর জোচ্চুরিটা একটু চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। এইবার মেয়ে দেখতে যাব যখন, দাদাকেও একবার দয়া কোরে যেতেই হবে—হেঁ—হেঁ—ছোট ভাইয়ের এইটুকু আবদার রাখতেই হবে।

দুনিয়াদারি

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

বি, এ, পাশ করিয়া রঙ্গলাল অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হইল।

বাড়ীতে তাহার বৃদ্ধ পিতা, গুটি কয়েক ভাই-বোন্, তাহাদের কোনটি পড়াশুনা করিতেছে, কোনটি পড়ার নামে সময় ক্ষেপ করিতেছে; এবং গুটি কয়েক বোন, কোনটির বিবাহ আর না দিলে ভালো দেখায় না।

পিসে মশাই বলিলেন, ড্যাম্ চাকরী, রঙ্গ, তুমি ব্যবসা কর। আমার এক ভগ্নিপতি হরিতকীর ব্যবসা করে লক্ষপতি হয়েছে,—চৌরঙ্গীতে চারখানা বাড়ী, বাড়ীতে দুইখানা মোটর।

লক্ষপতি! রঙ্গর চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

এই তো জীবন! মোটরে করিয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় ছুটিয়া চলা, পাশে টুকটুকে সুন্দরী বধূ, হাওয়ায় মাঝে মাঝে গুণ্ঠন খসিয়া পড়িতেছে, আঁচল উড়িতেছে ···

বাবা বলিলেন, এই তো সংসারের অবস্থা রঙ্গ, এইবার চাকরী বাকরী দেখ।

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কুন্ঠিতভাবে রঙ্গ বলিল, চাকরী··· রঙ্গর বাবা সেকেলে মানুষ। বলিলেন, কেন বাপু, বিদ্যেসাগর তো শুনিছি চাকরীই করতেন।

বিদ্যেসাগর! নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরী! রঙ্গ হাসিল, বলিল, দেখি তো।

* * *

সেকেলে লোক; বুঝাইতে যাওয়া মিথ্যা। বাঙ্গালী একটা কথা ধরিয়া রাখিয়াছে,—চাকরী। পচা, পুরোনো, মান্ধাতার আমলের যুক্তি।

পিসেমশাই বলিলেন, তোমার পার্ট্স্ আছে। তুমি পারবে। থেমো না, ভড়কে যেও না।

না, সে থামিবে না, ভড়কাইবে না, সে পারিবে। ওই একটা মালসাট মারা মাড়োয়ারি মাথায় হল্‌দে রঙের পাগড়ী জড়াইয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীট চষিয়া বেড়াইতেছে। জুল্‌ফির কোণ বহিয়া তেল গড়াইতেছে, পরণের জামাকাপড়ে চিমটি কাটিলে নখ বসিয়া যায়, এমন ময়লা। হাঁ, সেও পারিবে, আছেই তো পার্টস্।

রঙ্গ মুঠি বন্ধ করিল। এই মুঠিতে সে স্যামসনের শক্তি ধরিতে চায়। একটা ঘুসি মারিয়া দুনিয়ার একটা দিক সে টোল খাওয়াইয়া দিবে, এই তার সাধনা এবং কামনা।

বুকের কাছ ঘেঁসিয়া একটা মেম খট্‌খট্‌ করিয়া চলিয়া গেল। রঙ্গর বুকটা স্পন্দিত হইয়া উঠিল। নাকের উপর একটুখানি বাতাস বহিয়া গেল … একটু ভুর-ভুর গন্ধ … এবং একখানি সুন্দর মুখ …।

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের রাস্তা। বোঁ বোঁ করিয়া ক্রমাগত মোটর ছুটিতেছে,—পার হইবার উপায় নাই। ফুটপাতে সবাই ব্যস্তভাবে ছুটিতেছে, এক মুহূর্ত্ত নষ্ট করিবার জো নাই। যেন ক্লাইভ ষ্ট্রীটের নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে, আর সবাই ডাক্তার ডাকিতে চলিয়াছে,—এমন ব্যস্ত।

একটা সাহেব তাহার ঘাড়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! রঙ্গর মনে হইল এক ঘুসি মারিয়া উহার নাকটা রক্তাক্ত করিয়া দেয়।

* * *

ডিক্ টম্‌সন্ কোম্পানীর অফিস।

রঙ্গ দোতলায় উঠিয়া সটান্ হন্‌হন্ করিয়া সামনের ঘরে প্রবেশ করিতেই কোথা হইতে একটা তক্‌মা আঁটা উড়িয়া ছোকরা আসিয়া হাঁ হাঁ করিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। বলিল, কাকে চান বলুন।

রাগে রঙ্গর পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, অবিনাশ বাবুকে ডেকে দে।

ছোকরা তাহাকে বাহিরের বেঞ্চ দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কি অভদ্র এই আফিস! ছোকরাদের সহবৎও শেখায় নাই!

ছোকরাটা আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, জুতোর শব্দ করবেন না বাবু, সাহেব চটে যাবে। বেঞ্চে বসুন। বলিয়া দোর গোড়ায় এক টুলের উপর বসিয়া পা দুলাইতে লাগিল।

রঙ্গ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অবিনাশ বাবু আসিয়া বলিলেন, আপনি কি আমাকে খুঁজছেন?

রঙ্গ অবাক হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—আজ্ঞে না। আমি অবিনাশ বাবুকে চাই,—অবিনাশ রায়।

অবিনাশ বাবু অপ্রস্তুতের মতো একটু হাসিয়া বলিলেন,—ওঃ! বড় বাবুকে?—তাই বলুন! এ ব্যাটা … আচ্ছা আমি …

অবিনাশ বাবু চলিয়া গেলেন।

এইবারে বড় বাবু আসিলেন,—এই যে রঙ্গ! কি সংবাদ?

আপ্যায়ন করিবার মতো মনের অবস্থা রঙ্গর অনেকক্ষণ চলিয়া গেছে। শুষ্ক মুখে বলিল,—আমার সেই স্যাম্পলটা …

চোখটি বিস্ফারিত করিয়া বড়বাবু বলিলেন,—ও হো, হো, সে কথা তো ভুলেই গেছি। সাহেব ব্যাটা আবার … আচ্ছা তুমি কাল একবার …

আজ্ঞে না, কাল আর আমি আসতে পারব না।—রঙ্গর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল।—আমি আধ ঘণ্টার ওপর এইখানে দাঁড়িয়ে। আমি জানি নে, অন্য ভদ্রলোক কি করে আসেন, কিন্তু আপনার এই সব ছোকরাকে একটু ভদ্রতা না শেখালে আমার আর আসা সম্ভব হবে না।

হাতের কাছেই ছোকরাটা দাঁড়াইয়া একবার রঙ্গকে, একবার বড়বাবুকে নিরীক্ষণ করিতেছিল।

তাহার মাথায় এক চাটি মারিয়া বড়বাবু গর্জ্জন করিলেন,—শূয়ার কি বাচ্চা …

শূয়ার কি বাচ্চা হুড় হুড় করিয়া সিঁড়ি বহিয়া নামিয়া গেল।

বড়বাবু রঙ্গকে নিজের কামরায় লইয়া গেলেন।

ছোট একটুখানি ঘর। একটা টেবিল, তার উপর বিস্তর ফাইল স্তূপীকৃত; দোয়াত, কলম, একটা পিন কুশন; —কত কি। পাশে গোটা কয়েক চেয়ার। দূরে একজন ঘাঁড় গুঁজিয়া বসিয়া টাইপ করিতেছে, কিন্তু কান দুইটা এমন খাড়া হইয়া আছে যে, স্পষ্ট বুঝা যায় সব কথা শুনিবার আগ্রহ তার অত্যন্ত প্রবল।

একটু দম লইয়া বড়বাবু বলিলেন, দেখ, তোমার কাছে সব কথা স্পষ্ট করেই বলা ভাল, তুমি তো পর নও।

কথার গতি কোন্ দিকে বুঝিতে না পারিয়া রঙ্গ শুধু চাহিয়া রহিল।

বড়বাবু একবার আপাদমস্তক রঙ্গকে চশমার ফাঁক দিয়া দেখিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন,—কাপড় চোপর একটু ফর্সা রেখো হে। ভেক চাই, বুঝলে! তুমি যে আমার কাছে এসেছ, ও বেটা তা ভাবতেই পারে নি। তা ছাড়া,—গলাটা একটু খাটাইয়া বলিল,—দু চার পয়সা মধ্যে মধ্যে ওদের দিতে হয়,—এই বকশিস আর কি,—নইলে ওরা ঠিক খাতির করে না। ব্যবসা করতে গেলে এ সব করতে হয়।

হয় তো আরও অনেক কথাই বড়বাবু বলিয়া যাইতেন। বুড়া মানুষ, একটু বেশী বকা অভ্যাস। কিন্তু রঙ্গ মধ্য পথে বাধা দিয়া বলিল,—আর, আমার সেই স্যাম্প্‌ল্?

হ্যাঁ, তোমার সেই স্যাম্প্‌ল্!—বলিয়া আঙ্গুলের মাথাগুলির উপর একবার দৃষ্টি বুলাইলেন, কলমটা দোয়াতদানির উপর তুলিয়া রাখিলেন, একটা ঢোক গিলিলেন, একটু কাশিলেন, তারপর বলিলেন,—কি জান, কুচো হরিতকী নয়, তুমি কতকগুলো গোটা হরিতকী পাঠাও, এই সামান্যই।

—আচ্ছা, তাহলে কালকে …

বরং পরশু। কালকে আবার মেল ডে কি না; বুঝলে না?

রঙ্গ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বুঝিয়াছে। একটা নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিল।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছিয়াছে, উপর হইতে কে ডাকিল,—একটু শুনুন মশায়।

সেই লোকটি, যে ঘাড় গুঁজিয়া টাইপ রাইটারটির সামনে বসিয়াছিল। লোকটি হাসিয়া বলিল,—আপনি বুঝি বড় বাবুর আত্মীয়?

রঙ্গ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

লোকটি মাথাটি ডান দিকে হেলাইয়া বলিল,—দেখুন, এখানে বিশেষ—

সুবিধা হবে না? কিন্তু কেন বলুন তো?

লোকটি কৃতার্থের মতো হাসিয়া বলিল,—আজ্ঞে হঁ।—মাথাটি সামনের দিকে ঝুঁকাইয়া গলা একটু খাটো করিয়া বলিল,—কি জানেন, বড় বাবুর এতে দু'পয়সা হয়। আপনার কাছে তো আর—

ও! বুঝেছি, আচ্ছা নমস্কার। রঙ্গ চলিয়া গেল।

লোকটি দুই পাটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া প্রতি নমস্কার করিল।

* * *

সকালে বাড়ী হইতে চিঠি আসিয়াছে,—চিঠি নয়, টাকা ত্রিশের ফর্দ। ভায়েদের বই কিনিয়া পাঠাইয়া দিতে হইবে। ছোট ছোট ভাই, অত কথা বুঝে না। দাদা রোজগার করিতেছে, বই কিনিয়া পাঠাইয়া দেওয়া উচিত।

হাঁ, রোজগার বটে! সকালে দশটার সময় বাহির হয়, সন্ধ্যা নয়টার সময় ফিরিয়া আসে প্রায়ই শূন্য পকেটে। সমস্তক্ষণ রাজ্যের লোকের খোসামোদ!

রঙ্গর নিজের উপর ঘৃণা হয়।

চিনিবাস সামন্ত লড়ায়ের সময় লোহার কারবার করিয়া ফাঁপিয়া গিয়াছে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটে তাহাকে না চেনে এমন লোক কম। সুকিয়া ষ্ট্রীটে মস্ত বড় তেতলা বাড়ী করিয়াছে। ইচ্ছা করিলে রঙ্গকে ঠেলিয়া তিন ধাপ উপরে উঠাইয়া দিতে পারে। লোকটা তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া বসিয়া তামাক খায়, রঙ্গর মতো কত লোক তাহার দুয়ারে ধন্না দিয়া পড়িয়া আছে।

চিনিবাস বলে, কত বি, এ, এম, এ দেখলাম রঙ্গ,—কিছ্ছু না, এক লাইন ইংরিজি চিঠি লিখতে জিভ বেরিয়ে পড়ে।—বলে আর ঠোঁটের দু'কোণ দিয়ে যে পানের রস ঝরে, তাই ডান হাত দিয়ে মুছে মাথার কাছে দেওয়ালে হাতখানা ঘষে। দেওয়ালটা পানের রসে লাল হইয়া গেছে।

রঙ্গর গাটা কি রকম করিয়া উঠে।

ভিক্ টম্‌সনের আফিস হইতে বাহির হইয়া রঙ্গ এই লোকটির কথা ভাবিতে ভাবিতেই চলিতেছিল। পিছন হইতে কে আসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিল।—রঙ্গর মাসতুত দাদা।

দাদা বলিলেন, চাকরী জোগাড় হোল?

রঙ্গ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

—না তো এদিকে কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

রঙ্গ ডিক্ টমসনের আফিসের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল। তাহাতে ডিক্ টমসনের আফিসও বুঝাইতে পারে, সেই লাইনের আরও পাঁচটি আফিসও বুঝাইতে পারে।

দাদা বলিলেন, কিছু হোল না?

রঙ্গ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

দাদা তাহাকে হিড় হিড় করিয়া লালদীঘির এক নির্জ্জন কোণে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন,—চাকরী একটা খালি আছে।

রঙ্গ জবাব দিল না, বিব্রতভাবে দাদার দিকে চাহিয়া রহিল।

দাদা বলিতে লাগিলেন,—এখনও কেউ জানে না। সাহেব বলছিল, পরশু বিজ্ঞাপন দেবে। কাল তুই আসিস, দেরী করিস নে। ঠিক একটার সময়, সেই সময় মেজাজটা ভাল থাকে। তুই আসিস তো, সে আমি ঠিক করে নোব এখন। ব্যাটার আমার ওপর একটু নজর ভাল। তুই কাল আসিস, বুঝলি? মাইনে ···

রঙ্গ বলিল, কিন্তু কাল তো সময় হবে না ছোড়দা।

ছোড়দা মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—কেন? কাল তোমার কোন্ লাটের লেভিতে নেমন্তন্ন আছে শুনি?

রঙ্গ হঠাৎ বলিল, বৌদির চিঠি পেয়েছ ছোড়দা?

ছোড়দা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, হাঁ, ভালই আছে। তোর কথাও লিখেছে। তুই বুঝি চিঠি পত্তর দিস্ নে?

রঙ্গ হাসিয়া বলিল,—কাল একখানা দিয়েছি, ছোড়দা। তুমি গেছলে না কি খোকাকে দেখতে? কেমন হয়েছে?

ছোড়দা হাসিয়া বলিলেন,—লিখেছে তো বেশ হয়েছে! ওরই মতন রংটা হবে।

—লিখেছে? কেন তুমি যাও নি?

ছোড়দা একটু হাসিলেন। বলিলেন, যাই আর কি করে? পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে পাই, গেলেই তো পোনেরো দিনের মাইনে ···

কথাটা শেষ করিবার আর ছোড়দা সময় পাইলেন না। পাশ দিয়া তাঁহাদের আফিসের বড়বাবু, আধ-ময়লা পেন্টুলুন, গায়ে গলাবন্ধ কোট, পায়ে ফিতে বন্ধ জুতো, ছাতি মুড়ি দিয়া গুট গুট করিয়া চলিতেছিলেন।

ছোড়দা এক দৌড়ে তাঁহার কাছে গিয়া কি বলিল, রঙ্গ শুনিতে পাইল না, শুধু দেখিল আনন্দের আতিশয্যে তাঁহার দাঁত বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

ছোড়দা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—অতি কিপ্‌টে ব্যাটা, দু'শো টাকা মাইনে পায়, মাণিকতলায় ছোট্ট একটা বাড়ীও করেছে। ব্যাটা রোজ সেই মাণিকতলা থেকে লাল দীঘি আর লালদীঘি থেকে মাণিকতলা হেঁটেই মেরে দেয়।

একটু পরে আবার বলিলেন, খোসামোদ করা ভালো রে। ব্যাটারা ভালো করতে না পারুক, মন্দ করতে খুব। আচ্ছা, কাল যাস তা হোলে,—নিশ্চয়—

ছোড়দা সোজা চলিয়া গেলেন।

* * *

সবাই চাকরীর কথা বলে। রঙ্গ আত্মীয়ের বাড়ী যাওয়া বন্ধই করিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে শুধু ছোট-বৌদিই যেন তাহার ব্যথা কিছু কিছু বুঝিত। অস্বাভাবিক—সবাই যেখানে অন্ধ, সেখানে একজন লোক যদি সে কথা বুঝে, তাহা অস্বাভাবিক বই কি।

সহানুভূতি!—অতি ঘৃণিত জিনিষ।

সবাই রঙ্গর দুঃখে সহানুভূতি করিতে আসে। বলে, তাই তো হে, যা ব্যাপার আজ কাল, চাকরী কোথাও জোটান মুস্কিল!

এ কথা কেহ বুঝিবার চেষ্টাও করে না, তাহার কামনা চাকরীর ঊর্দ্ধে। কোনরূপে বাঁচিবার উপর তাহার ঘৃণা জন্মিয়াছে।

ঘৃণা তো জন্মিয়াছে, কিন্তু এমন-করিয়াই যা বাঁচা যায় কতদিন,—এমনি কখনো অনাহারে, কখনও অর্দ্ধাহারে।

ভাইগুলির বই পাঠান হয় নাই। নাবালক শিশু,—কত কিই হয় তো ভাবিতেছে।

মেসের খরচ আজ না মিটাইয়া দিলে হয় তো অপমানিতই হইতে হইবে। অথচ, হাতে একটিও পয়সা নাই।

রঙ্গ অনেকক্ষণ ভাবিল, কিন্তু দশটা টাকা ধার দেয়, এমন কাহারও নাম মনে পড়িল না। যাইবেই বা কাহার কাছে, সবারই কাছে হাত পাতা শেষ হইয়া গেছে।

তাই তো!

কিন্তু বসিয়া বসিয়া ভাবিলে চলিবে না। এই সূর্য্যোদয় হইল, রঙ্গকে এইবার উঠিতে হইবে এবং রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত বোধ হয় অনাহারেই কলিকাতা চষিয়া বেড়াইতে হইবে। অনাহারে,—রঙ্গ পকেটে হাত দিল।—নাঃ, পাঁচটা পয়সা এখনও আছে;—তিন পয়সার চা, এক পয়সার পান, এবং কালকের জন্ত একটা পয়সা থাকিবে, পান খাওয়াটা চলিবে।

পান,—অনাহারের লজ্জা ঢাকিবার এমন মহৌষধ আর নাই।

রঙ্গ চুলগুলি ঠিক করিয়া শিস্ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল।—সাতটার সময় ভবতোষ বাবুর সহিত এন্‌গেজ্‌মেণ্ট।

ভবতোষ বাবু মোটাসোটা বেঁটে-খাটো মানুষটি। আহারের জোরে পেটের উপর একটি ভুঁড়িও গজাইয়াছে। মাথায় টাক, গোঁফদাড়ি কামানো, পায়ের গোছ দুটি এতই সরু যে, এই বিরাট দেহটি বহিতে সে দুটিতে যে কষ্ট হইতেছে, তাহা বোঝা যায় খোঁড়াইয়া চলার ভঙ্গীতে। হউক খোঁড়া,—লোমনাশক সাবান বিক্রি করিয়া ভবতোষ বাবু বেশ দুই পয়সা করিয়াছে।

মনটা ভবতোষ বাবুর একটু খারাপ ছিল। কেউ আসিয়া বিরক্ত করিয়া গেছে।

বিরক্ত করিব্যর লোকের তো অভাব নাই, একদল বিজ্ঞাপনের এজেণ্ট তো তাহাকে উদ্বাস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে। দেশের ছোট-বড় অনেকগুলি কাগজেই তার বিজ্ঞাপন আছে। লোকে বলে, এই বিজ্ঞাপনের জোরেই তার কারবারের বাড়-বাড়ন্ত। ভবতোষ বাবু তা স্বীকার করে না, বলে, ওরাই খাচ্ছে আমার পয়সায়।

পয়সা বড় দিতে হয় না। বিজ্ঞাপনে অনেক ভুল থাকেই, কোথাও ভাষার, কোথাও বানানের।

ভাষার উপর ভবতোষ বাবু অত্যন্ত চটিয়া গেছে। বলে, এই রবি বাবুই ভাষার পিণ্ড চটকাইয়াছে। দাশু রায়ের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া দুঃখ করে। বলে,—কি লেখাই লিখে গেছে! ব্যাটার কণ্ঠে যেন সাক্ষাৎ মা সরস্বতী বসেছিল। আর আজকালকার—ঠোঁট উল্‌টাইয়া বলে, —ছোঃ!

প্রথম প্রথম রঙ্গ সহিতে পারিত না, মনে হইত যা মনে আসে তাই বলিয়া দিয়া চলিয়া আসে; বলিয়া দেয়, তুমি বাপু, লোমনাশক সাবান বিক্রি করিতেছ, তাই কর, আবার এদিকে নাক ঢোকাও কেন?

বন্ধুরা বলিত,—ঢোকাইবে না? তোমার ঘরে যখন দরজা জানালার রেওয়াজ নাই, তখন যাহার নাক আছে সে-ই নাক ঢোকাইবে;—বেশ করিবে।

বলিবার কিছু নাই।

রঙ্গ ভাবিত, বলিয়া যাক যা যার খুশী। চাকা যদি কোন দিন ঘুরে, এমনি করিয়া টাকার উপর বসিয়া থাকিবার দিন যদি কখনও আসে, সেদিন ইহার মুখের উপর জবাব দিয়া যাইবে। এবং আজ যাহারা চারিপাশে বসিয়া ক্রমাগত সায় দিয়া যাইতেছে, সেদিন ইহারাই তাহার বালাখানায় বসিয়া ঠিক উল্‌টা কথা বলিয়া যাইবে।

এখন রঙ্গর সহিয়া গেছে, সমস্ত কিছুতে সায় দিতে আজ আর তাহার বাধে না।

রঙ্গকে দেখিয়া ভবতোষ বাবু প্রথমটা কথাই বলিল না,—আলবোলাই টানিয়া যাইতে লাগিল। রঙ্গ ভয়ে ভয়ে ফরাসের এক কোণে চুপ করিয়া রহিল, কথা কয় এমন সাহস নাই।

একটু পরে ভবতোষ বাবু হাতের কাছের কাগজখানি রঙ্গর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল,—দেখেছ এ খানা?

ঠিক কোন্‌টুকু ভবতোষ দেখাইতে চান, না বুঝিতে পারিয়া রঙ্গ কাগজখানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

ভবতোষ বাবু তাকিয়া ছাড়িয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, আরে এটা কি একটা বাঙ্গলা হয়েছে! একটি পয়সা দোব না বেটাদের।

এতক্ষণে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হইল। ভবতোষ বাবু বকিয়া যাইতে লাগিল, ক্রমাগত এবং অনর্গল, যাহার অনেক কথা মিথ্যা, এবং অনেক কথা বানানো।

কিন্তু যে কথা বলিবার জন্য রঙ্গ সমস্ত পথ নিজেকে তালিম দিতে দিতে আসিয়াছিল, তাহাই তাহার ভুল হইয়া যাইতে লাগিল।

কয়টা টাকার তাহার একান্তই প্রয়োজন। অথচ কথাটা কেমন করিয়া পেশ করিলে ঠিক হয়, তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

ভবতোষ বাবু ক্রমাগতই বকিয়া চলিল।

রঙ্গ বলি-বলি করিয়াও কোনো রকমে কথাটা তুলিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে নমস্কার করিয়া উঠিয়া পড়িল। পথে আসিতে আসিতে মনে মনে ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—উপবাস করিতে ভয় করি না প্রভু, কিন্তু একটা গভীর লজ্জার হাত হইতে তুমি আমাকে বাঁচাইলে।

* * *

সকালে সন্ধ্যায় রঙ্গ একটুখানি ভগবানের ধ্যান করে। আগে করিত না, বলিত; সত্যকার বিশ্বাস যদি তাঁর ওপর থাকে, অমন করে খোসামোদ না করলেও চলে।

এই লইয়া পণ্ডিতদের সঙ্গে অনেক তর্কই সে করিয়াছে। মানুষ যে কাহারও কাছে মাথা নত করিবে ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না।

তারপরে দুঃখের দিন যতই ঘোরালো হইয়া আসিতে লাগিল। প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া দেখিয়াছে, কিছু হয় নাই; বুঝিয়াছে সংগ্রাম করিবার, সহ্য করিবার শক্তিই পর্য্যাপ্ত নয় এবং বিশ্বাস জন্মিয়াছে, মানুষ শুধু সংগ্রামই করিতে পারে, সহ্যই করিতে পারে, সাফল্য তার হাতে নাই।

তবু লজ্জা করে। সেদিন তার একটি বাল্যবন্ধু আসিয়াছিল, রঙ্গ তার সামনে দেওয়ালে টাঙ্গানো কালীর ছবিকে প্রতিদিনকার মতো প্রণাম করিতে পারে নাই, সকালে সন্ধ্যায় ধ্যানও হয় নাই। মনে মনে শুধু মা'র কাছ হইতে ক্ষমা চাহিয়া রাখিয়াছে।

মাঝে-মাঝে এ-ও মনে হইত, বুঝি পূর্ব্বের সে তেজ আর তার নাই। মাঝে মাঝে মনে হইত এত দুঃখ কষ্টের পর এতদিনে বুঝি সে সত্যের সন্ধান পাইল। কখনও ভালো লাগিত, কখনও লাগিত না।

মাঝে মাঝে বাড়ীর কথা মনে পড়িত ···।

ছায়ায়-ঘেরা পাখী-ডাকা বনপথের উপর ছোট্ট বাড়ী,—মাটির ঘর, খড়ের চাল। সামনে খানিকটা ঝক-ঝকে তক-তকে উঠান, তার উপর সার-সার খড়ের পালা। এক কোণে একটা অশ্বথ ঘটের মতো দাঁড়াইয়া আছে, নীচেটি তার বেদী বাঁধানো। সকাল বেলায় তারই উপর চাটাই বিছাইয়া বাড়ীর ছেলেরা পড়িতে বসে। উঠানের মাঝখানে একটা গরুর গাড়ী পড়িয়া আছে এবং সমস্ত দিন ছোট-ছোট ছেলে মেয়েদের অত্যাচার সহিতেছে, রঙ্গর বাবাকে সে জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক হইয়া থাকিতে হয়।

তার ছোট-ছোট ভাইবোনগুলি,—কেহ বা ময়লা, তালি-মারা ছেঁড়া একটা জামা গায়ে দিয়া খেলা করিতেছে, কেহ বা দিগম্বর হইয়াই উঠানময় নাচিয়া বেড়াইতেছে। তার সব ছোট ভাইটির কাপড় পরিবার সখ খুব বেশী, না পাইলে কাঁদে। মা তাই কার একখানা বড় কাপড় এক রকম আঁটিয়া-সাঁটিয়া জড়াইয়া দিয়াছে, কোমরের দিকটা প্রকাণ্ড মোটা হইয়া আছে। তাহাই পরিয়া তার আনন্দ দেখে কে!

এমন করিয়াই বা কয়দিন সংসার চলিবে। কিন্তু, সেই-ই বা কি করিতে পারে? এখন তাদের সময় খারাপ পড়িয়াছে, সবই সহিতে হইবে। বাবা অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছেন, চিঠি পত্র দেওয়া প্রায় বন্ধ করিয়াছেন। মিথ্যা রাগ। তিনি তো বুঝেন না, রঙ্গর চেষ্টার ত্রুটি নাই, কিন্তু যিনি দিবার মালিক তিনি না দিলে সে কি করিবে!

একটা হিন্দুস্থানী একদিন একটা কথা বলিয়াছিল, সেই কথাটি রঙ্গর মাঝে মাঝে মনে পড়ে,—চার্ ভুজা যব্ দেতা হায়, দো ভুজ্‌মে তব্ কেত্তা রাখোগে,—মগর্ চার ভুজা যব্ দেতা হায়, দো ভুজ্‌মে তব্ কেত্তা লেওগে।

'দো ভুজ্‌মে তব্ কেত্তা লেও গে' কথাটি রঙ্গ বার-বার মনে-মনে আবৃত্তি করে,—মনে বল পায়।

তারপর সম্মুখে টাঙ্গানো মা-কালীর ছবির দিকে চাহিয়া বারম্বার প্রণাম করে।

* * *

অনেক দিন পরে রঙ্গ মাসীমার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। দোতলার সিঁড়ি বহিয়া উঠিতেই সামনে ছোড়দা।

ছোড়দা হাঁকিলেন, ও মা, এই নাও, তোমার রজ বাবু এসেছেন।

মামীমা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কি গো বড়লোকের ছেলে, এতদিনে গরীব মামীমাকে মনে পড়ল?

রজ তো চোর!

ডান দিকের ঘরের ভিতরে বৌদি কোলের উপর ছেলেকে শোয়াইয়া ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়াইতেছিলেন। বাঁ পা টা দোলাইতে দোলাইতে তিনিও আড় চোখে চাহিয়া হাসিলেন, চুপি চুপি বলিলেন, একখানা চেয়ার দোব কি?

রজ দেখিল এতগুলি আক্রমণকারীর মধ্যে শেষেরটিই অপেক্ষাকৃত দয়ালু, তাই সটান সেই ঘরের মধ্যেই ঢুকিয়া পড়িল।

ছোট্ট ছেলে, মায়ের কোলের উপর শুইয়া মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিতেছিল। একটু আগেই বোধ হয় এক দফা কান্নাও হইয়া গেছে, চোখের কোণে একটুকু জল তখনও জমিয়া ছিল।

রজ খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল। বৌদি বলিলেন, একটু থামো, এখনও দুধ খাওয়ান হয় নি যে।

রজ খোকার হাতে গোটা কয়েক টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—দুধ, দুধ,—দুধ তো সারাদিনই খাওয়ান হচ্ছে।

বৌদি বলিলেন, ও কি হোল? টাকা বুঝি বেশী হয়েছে!

রজ হাসিল,—ক্ষীণ হাসি। কথা বলিল না, শুধু পাশের খাটখানার উপর খোকাকে কোলে করিয়া বসিল।

বৌদি একটু দূরে চৌকাঠের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন,—তারপরে? এতদিন পরে মনে পড়ল?

রজ খোকার গাল দুটি টিপিয়া দিয়া বলিল,—মনে আমার বরাবরই আছে বৌদি, কিন্তু সময় পাই নে যে আসি।

—কেন? এত কি কাজ তোমার? কি কর্চ্ছ এখন?

কাজ, কাজ, কাজ!

কাজের কথা শুনিলে রজর বুকটা কেমন যেন ভারী হইয়া উঠে,—সমস্ত আনন্দ এক মুহূর্ত্তে কোথায় উড়িয়া যায়।

তাই তো! সমস্ত দিন বহিয়া গেল, কি করিয়াছে সে!

বলিল,—কিছু না।

—কেন ব্যবসা না কি একটা যেন করছিলে। তা ছেড়ে দিয়েছ?

রজ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

—তবে? কিছু হচ্ছে না?

—না।

দুই জনেই চুপ করিয়া রহিল,—একজন ব্যথার ভারে, একজন সমবেদনায়।

খোকা নড়িয়া উঠিল। মায়ের কোলে যাইতে চাহে।

রজ খোকাকে বৌদির কোলে নামাইয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে বৌদি বলিলেন, কেন, ব্যবসা তো বেশ ভালো জিনিষ।

রজ হাসিল,—ভালো জিনিষই তো।

—তবে?

এ 'তবে'র উত্তর দেওয়া কঠিন। কেন ব্যবসা ফেল পড়ে, বাঙ্গালীর ছেলের মুস্কিল কোথায়, বাধা কি, এক কথায় তা বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। তর্ক করিলে ঠকিতে হয়, এবং তর্কে জিতিয়া গেলেও ব্যবসা করা সহজ হইয়া উঠে না।

রজ চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরে বৌদি হাসিয়া উঠিলেন।

—হাস যে?

বৌদি বলিলেন, তুমি নাকি সন্ন্যাসী হচ্ছ?

—না। কোনো দিন না। কে বলে?

—সবাই বলে।

রজ হাসিল, বলিল,—সবাই কে? তুমি বল?

—আমি বলি না। কারণ, আমি জানি তুমি সন্ন্যাসী হওয়ার ছেলে নও। কিন্তু, তুমি নাকি খুব জপ-তপ করো?—তোমার ঘরে নাকি ঠাকুর-দেবতার ছবি টাঙানো থাকে?

—থাকে। কিন্তু, সে কি দোষের?

বৌদি কথাটা ফিরাইয়া লইলেন। বলিলেন, কিন্তু, তুমি বিয়ে করছ না কেন বল ত?

গভীর দুঃখের সঙ্গে রজ বলিল,—মেয়ে কই?

বৌদি গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলিলেন,—কেন, বাংলা দেশের এত মেয়ে কি সব বিলেত গেছে?

—কি জানি কোথায় গেছে বৌদি, কিন্তু, দাও না খুঁজে একটি।

বৌদি হাসিলেন।—না, সত্যি ঠাকুরপো, করবে বিয়ে?

রঙ্গ একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল,—কিন্তু, তুমি কি ভাবতে পার বৌদি, আমার হাতে কেউ মেয়ে দিতে পারে? আমার মতন এমনি একটা—

—কেন, তুমি কি খারাপ পাত্র?

—না। খুব ভালো পাত্র।

—কেন, বি, এ, পাশ করেছ—

—এবং কিছুদিন এম, এ-ও পড়েছি। তুমি একটা সত্য কথা বলেছ বৌদি, সন্ন্যাসী হবার ছেলে আমি নই।

রাস্তায় সুন্দরী মেয়ে দেখলে আমি থমকে যাই, বুকের পাশ দিয়ে সুন্দরী হেঁটে গেলে তার অঙ্গের সৌরভে আমি আত্মহারা হই। বিয়ে আমি করতে চাই, এবং করতে পারিও। আমি তাকে ভালোবাসতেও পারি, কিন্তু খেতে দিতে পারব না। কথা তাই নিয়ে বৌদি, না খেলেও প্রেম চলে কি না, সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে।

দুজনেই চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরে রঙ্গ বলিল,—বৌদি, বাঙ্গালীর ছেলে কোনদিন খাঁটি ব্যবসাদার হতে পারে না।

—কেন, বল ত?

—প্রথম বাধা,—তার শিক্ষা।

—কেন, শিক্ষার অপরাধ কি?

রঙ্গ উত্তেজিত হইয়া খাটের উপর একটা চাপড় দিয়া বলিল,—তর্ক করলে হবে না বৌদি, শুধু শুনে যাও। তর্ক এ নিয়ে অনেক ওঠে জানি, কিন্তু এ আমার নিজের রক্ত দিয়ে শেখা কথা, এ নিয়ে আমি কাউকে তর্ক করতে দোব না।

রঙ্গ হাঁফাইয়া উঠিল।

তারপরে বলিল,—কিন্তু, শিক্ষাই তার সব চেয়ে বড় বাধা নয়। টাকার লোভে মানুষ যখন চুরীও করে, তখন তার আদর্শ এবং আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দেওয়া খুব বড় কথা নয়। আসল বাধা তার সমাজ।

কি যেন একটু ভাবিয়া লইল। বলিল,—হাঁ, সমাজ। একে আমি ভেঙ্গে চুরে গুঁড়িয়ে দিতে চাই।—রঙ্গ হাতের মুঠি বন্ধ করিল।—দু'পা দিয়ে মাড়িয়ে যেতে চাই। ছেলে বি, এ, পড়তে আরম্ভ করেছে কি, বাপ দিন গুণতে সুরু করলেন, এ ক'টা দিন পরেই ছেলের ঘাড়ে সংসারের ভার চাপিয়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হবেন। বি, এ, পাশ করার পর ছেলে দুটো দিন ভাবতে সময় পায় না, কোন্ পথে সে যাবে। সংগ্রাম করবে কি? পেছন থেকে নানা কণ্ঠে আর্ত্তনাদ উঠলো, আমরা যে মরি, তুমি যা-হয় একটা কর। কত দিন পারে ছেলে! শেষে তাকে সামনে যা পায় তাই নিয়েই সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিতে নিশ্চিন্ত-হতে হয়।

—তা হলে ছেলেদের কি করা উচিত? বাপ-মা খেতে না পেয়ে মরবে?

সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রঙ্গ বলিল,—হাঁ মরবে। কি করবে ছেলে?—কি করতে পারে সে? তার যে সংগ্রাম, অনাহারে অনিদ্রায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চালানো, সে তো তাঁদেরই জন্যে। বাংলার বাপ-মা মরুক বৌদি, তাতে কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু এই সব ছেলেদের আদর্শ যদি বাতাসে মিলিয়ে যায় সে ক্ষতির পরিমাণ নেই।

বৌদি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—তুমি বল কি ঠাকুরপো? তাই বলে বাপ-মা'র 'পরে ছেলের কোনো দায়িত্ব নেই? আমার এই খোকা, এ বড় হোলে আমাদের উপর এর কোন দায়িত্ব নেই!

এবারে রঙ্গ হাসিয়া ফেলিল। বলিল, কোনো দায়িত্ব নেই বৌদি, যেমন কোনো গ্যারাণ্টি দিয়ে কোনো খোকা কোনদিন পৃথিবীতে আসে না।

তারপরে একটু গম্ভীর হইয়া বলিল,—কিন্তু, চল্লিশ-টাকা মাইনের কেরাণীগিরিতে ঢুকলেই কি সে দায়িত্ব সম্পন্ন হয়, বৌদি?

বৌদি উত্তর দিলেন না।

একটু পরে বলিলেন, আজ রাত্রে তোমায় ছাড়চি নে ঠাকুরপো। এখানে খেয়ে যেতে হবে।

রঙ্গ জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—এটি মাপ করতে হবে বৌদি,—থাকতে পারবো না।

—কেন?

—না।

রঙ্গ যাইবার উপক্রম করিতেই বৌদি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—উঠছ কি? জল খাবার খেয়ে যেতে হবে। একটু বোসো, আমি দু'খানা লুচি ভেজে নিয়ে আসি।

রঙ্গ বাধা দিয়া বলিল,—না, না, জল খাবার কি হবে? আমি বিকেলে জল খাবার খাই নে।

—কি খাও তবে?

—কোনোদিন এক গ্লাস জল, কোনোদিন তাও না।

রঙ্গ চলিয়া গেল।

* * *

ইহারই বছর দুয়েক পরে ড্যালহৌসি স্কোয়ারের কাছে ছোড়দা রঙ্গকে ধরিয়া ফেলিলেন।

—বাঃ, চাকরীতে ঢুকে আর বুঝি আমাদের মনেও নেই!

রঙ্গ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

ছোড়দা ট্রামের দিকে রঙ্গকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন,—চাকরী লাভের সংবাদে তাঁহারা সকলে কত খুসী হইয়াছেন। সবাই রঙ্গকে দেখিতে ব্যাকুল, অথচ রঙ্গ বাবুর দুই পা গিয়া আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করিবারও সময় হইয়া উঠে না,—চাকরী পাইয়া মেজাজ গরম হইয়া গিয়াছে। সুসংবাদ পাঁচ জন আত্মীয়কে জানাইবার একটা প্রথা আছে, রঙ্গ তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে। ইত্যাদি—

মাস কয়েক হইল রঙ্গ কুক কোম্পানীর আফিসে আশী টাকায় একটি চাকরী পাইয়াছে। বাঙ্গালীর ছেলে সহজে এমন একটা চাকরী পায় না। তবু এতবড় ভাগ্যেতিহাস সে কাহাকেও জানায় নাই। লোক পরম্পরায় যাহারা শুনিয়াছে আত্মীয় এবং শুভেচ্ছু, তাহারা সকলেই আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছে। রঙ্গ কাহাকেও উত্তর দিয়াছে, কাহাকেও দেয় নাই।

সাহেবও রঙ্গকে খুব ভালবাসে। তাহারও একটু কারণ আছে। রঙ্গর সহজবুদ্ধি বরাবরই একটু প্রখর। কিন্তু প্রীতির তাহাই একমাত্র কারণ নয়।

হরতালের দিন মুষ্টিমেয় যে কয়জন আফিস গিয়াছিল, রঙ্গ তাহাদেরই একজন। সকল কেরাণী-বন্ধুই তাহাকে অনুনয় বিনয় করিয়াছিল। কাহারও কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ সে করিতে পারে নাই, শুধু চোরের মতো সন্তর্পণে সর্ব্বাগ্রে কোন এক সময় আসিয়া কাজ করিতে লাগিয়া গিয়াছিল।

ট্রামখানি রঙ্গর বাসার কাছে আসিতেই রঙ্গ শুধু মিনতির সুরে কহিল,—ছোড়দা, এইবার তা হলে ...

ছোড়দা তীব্র দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিতেই শান্ত শিশুর মতো আবার স্বস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। কথাও কহে না,—কিছু না, শুধু বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকে। রঙ্গর অহঙ্কারে ছোড়দার বিরক্তির সীমা নাই।

মাসীমা রঙ্গকে সস্নেহে স্পর্শ করিয়া আনন্দাশ্রু ফেলিলেন। বলিলেন, দেখ্ দেখি বাবা, এতদিন যদি চাকরী করতিস্ কত মাইনে হোত! কী যে ভূতে ধরেছিল!

বৌদি এক বাটি চা রঙ্গর কাছে নামাইয়া দিয়া বলিলেন,—কিন্তু মিষ্টি খাওয়াচ্ছ কবে বল ত?

রঙ্গ অপ্রতিভের মতো হাসিয়া শুধু বলিল,—বেশ ত!—যেন এই প্রথম এখানে আসিল।

বৌদি বলিলেন,—তুমি কি নতুন জামাই, শ্বশুরবাড়ী এসেছ ঠাকুরপো? পোষাকটি তো জামাইয়ের মতোই হয়েছে। তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে, ঠাকুরপো!

এবারে রঙ্গ বৌদির পানে চোখ মেলিয়া চাহিল,—পলকের জন্য, তখনই আবার নামাইয়া লইল।

সে কি দৃষ্টি! পলাতক ফেরার আসামীর চোখে যে সশঙ্ক দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে সেই দৃষ্টি!

বৌদি ভীতি-বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যেন কতকটা আত্মগত ভাবে,—এই রকমই ভেবেছিলাম। সবাই বল্তো, অহঙ্কারে

তোমার মাটিতে পা পড়ে না। আমার মন কোনদিন তাতে সায় দেয় নি।

একটু থামিয়া বলিলেন, তোমার সঙ্গে আজ যদি আমার প্রথম পরিচয় হোত, কিছুতেই তোমার সামনে বেরুতাম না। কোন ভদ্রমহিলা তোমার সামনে বেরুতে পারে না!

রঙ্গ কাঠ হইয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল। জবাব দিবার জন্য তাহার শিক্ষিত মন উস্‌খুস্‌ করিয়া উঠিল, কণ্ঠ একটু নড়িয়া উঠিল, জবাব কিন্তু দিতে পারিল না।

মা যেমন মমতায় রুগ্ন সন্তানের অঙ্গে পরশ বুলাইয়া দেন, তেমনি মমতায় এই দরদী বন্ধু বলিলেন, কাজ নেই ঠাকুরপো, চাকরী ছেড়ে দাও।

অস্পষ্ট কণ্ঠে রঙ্গ কি বলিল বুঝা গেল না, শুধু শুনা গেল,—বাপ মা ...

সে যা হবার হবে ঠাকুরপো, কিন্তু এমন কোরেও তো নিজের সর্ব্বনাশ করা যায় না।

রঙ্গ একটু ম্লান হাসিল। বলিল,—বৌদি, আমার 'পরে তোমার করুণার অন্ত নেই। মাঝে মাঝে নিজের কথা ভাবতে চেষ্টা করি, বুঝি, কত কি আমার হারিয়ে গেছে। তবু যখন দেখি আমারই পাশের টেবিলে আমার চেয়ে হতভাগ্য কেরাণীর দল নিশ্চিন্ত ঔদাসিন্যে হাসছে, গল্প করছে, পরনিন্দা পরচর্চ্চা করছে, স্বদেশ উদ্ধার—কত কি করছে তখন যন্ত্রণায় আমারও চোখ বন্ধ হয়ে আসে।

দিনান্তের শেষ আলোটুকুও ম্লান হইয়া গেল, প্রায়ান্ধকার গৃহ-কোণে দুটি দরদী বন্ধু ব্যথা-ছলছল নেত্রে নিঃশব্দে কতক্ষণ শূন্যে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণেক পরে বৌদি বলিলেন,—তোমার বিয়ে নাকি ঠিক হয়ে গেছে?

—হুঁ।

—এর পরেও বিয়ে করবে?

রঙ্গ হাসিয়া বলিল,—কেন করব না বৌদি? কেরাণীর কি কামনা থাকতে নেই?

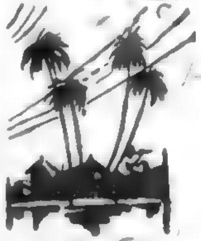

বন্দনা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সদ্য ফোটা কুসুমের অনাঘ্রাত হে সদ্য সুবাস !
উদয়-মন্দির-মূলে হে তরুণ অরুণ আভাষ !
প্রভাত-আলোক স্পর্শে ওগো দীপ্ত সদ্যমেলা আঁখি ।
সদ্য জাগা কলকণ্ঠ হে নূতন, গান ধরা পাখী !
জগতের হে প্রথম, নবরূপ, মাধুর্য্য সম্ভার,
ওগো আদি, ওগো চারু, তরুণের লহ নমস্কার ।

আষাঢ়ের নবমেঘ, বার্ত্তাবহ বিরহীহিয়ার—
কলকণ্ঠ হে পাপিয়া, ওগো চির-চারণ প্রিয়ার !
মিলনের বার্ত্তাবহ সৌন্দর্য্যের ওগো অপরূপ,
হরিতে হিরণে মাখা শরতের দীপ্ত নবরূপ !
হে কিশোর, হে কোমল, হে ব্রজের বাঁশরী ঝঙ্কার,
হে চির-তরুণ, তুমি তরুণের লহ নমস্কার ।

যুগে, বর্ষে নবরূপ বৈশাখের হে কালবৈশাখী,
জীর্ণ ধ্বংসী গীতামন্ত্র, ওগো শিব সুন্দর পিনাকী,
হে নূতন জাগরণ হে ভীষণ হে চির অধীর,
হে রুদ্রের অগ্রদূত, বিদ্রোহের ধ্বজবাহী বীর,
জ্বল জ্বল দীপ্ত আঁখি দৃঢ় ওষ্ঠে হাস্যরেখা আঁকা ;
দীর্ঘ রুক্ষ কেশগুচ্ছে দীপ্ত শুভ্র ললাটিকা ঢাকা,
ঝঙ্কার প্রবাহে নাচে কেশগুচ্ছ, গৈরিক উত্তরী,
সেথা তুমি জীর্ণে নাশি নবীনের ফুটাও মঞ্জরী,
হে সুন্দর, হে ভীষণ, হে তরুণ হে চারু কুমার,
হে আগত, অনাগত, তরুণের লহ নমস্কার ॥

রস ও নীতিধর্ম্ম

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

সাহিত্যকে আমরা এতকাল ধরে রসের ব্যাপার ব'লেই মনে ক'রে এসেচি। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্, এ শ্লোকটি আমরা শুধু কাব্য-সাহিত্য আলোচনা করবার বেলাই যে আওড়াই তা নয়, গদ্যসাহিত্যকেও আমরা কাব্যেরই একটা রকম ফের ব'লে স্বীকার করে এসেচি; এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আমাদের মনে স্থান পায় নি।

তারপরই রস নিয়ে নানা রকমের বিচার বিবেচনার সূত্রপাত। কিন্তু নানা জটিল আলাপ আলোচনার শেষেও রসের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে বিশেষ গভীর হয়েচে তা মনে করবার কোনো হেতু নেই। চিত্তকে যা রসিয়ে তোলে, মধুর রসের আস্বাদনে যেমন আনন্দ হয়, সাহিত্যের মধ্যে তেমনি যা আমাদের মনে মাধুর্য্যকে জাগিয়ে আমাদের আনন্দ দেয় তাই রসবস্তু, এ ছাড়া আর কিছুই এত সব আলোচনার পরও আমাদের জ্ঞানগম্য হয় নি। উপরন্তু আরো এই কথাই জানা গেল যে রসিকজনের মনে যাতে রস জাগে তাই হলো সত্যিকারের রস, বেরসিকরা যাতে রস পায় সেটা হলো বিরস। এমনি ক'রে রসতত্ত্ব গুহাহিত তত্ত্বের মতই রহস্যময় হয়ে রইল।

যাঁরা রসিক ব'লে দাবী জানিয়েচেন সেই সব আলঙ্কারিক এবং সাহিত্য-সমালোচকেরা ভিন্ন ভিন্ন কালে এই রসবিচারের কতকগুলি নিয়ম বাঁধবার চেষ্টা করেচেন দেখা যায়। এবং এও দেখা যায় যে, ঠিক তাঁদের পর পরই আবার এমন সব রসস্রষ্টার আবির্ভাব হয়েচে যাঁরা সেই সব নিয়মকে ডিঙিয়ে গিয়েই মানব-চিত্তকে রসায়িত করবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেচেন। কিছুকাল হয়ত নিয়মানুবর্ত্তী পাঠকের দল পূর্ব্ব সংস্কারের বশে একটু গোলমাল করেচেন কিন্তু তারপরই ধীরে ধীরে নূতনভাবে রসকে উপলব্ধি করতে পেরেচেন। ফল কথা, কিসে যে আমাদের চিত্ত রসিয়ে উঠবে না, তার কোনো রকম সীমা-নির্দ্দেশই চলে নি; ভবিষ্যতেও চলবে এমন মনে করবার কারণ নেই।

এই যে রসের আবেদন, এটি রসিক-মনের কাছে, সামাজিক-ভালোমন্দ হিতাহিত-বিবেচনাশীল মনের কাছে নয়, এমন ধারা কথা সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে যে না উঠেচে তা নয়। তার কারণ বোঝা বিশেষ কঠিন নয়। এই যে রসের আবেদন এটা আমাদের সৌন্দর্য্য বুদ্ধির কাছে, হিতাহিত বুদ্ধির কাছে নয়। যখন আমাদের মনে কোনো সৌন্দর্য্য জেগে ওঠে তখন তাতে আমাদের ভালো হবে কি মন্দ হবে সে বিচারই জাগে না। ফুল সুন্দর যখন বলি, তখন তাতে আমাদের কতখানি ভালো হবে সে বিচারই করি না, নদীর সৌন্দর্য্যে যখন আত্মহারা হই তখনো তাতে কৃষিকর্ম্মের দিক দিয়ে তার উপকারিতা অপকারিতার হিসাব রাখি না। রসবোধের ক্ষেত্র, সৌন্দর্য্যবোধের ক্ষেত্র,—নৈতিকবোধের ক্ষেত্র নয়। রসিকেরা এই কারণেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে, রসের ক্ষেত্রে নৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষার কাতরতাকে কৌতুকের বিষয় বলেই মনে করেচেন।

মানুষের মনোজগতে যদি তার রসবোধ আর নীতিবোধ এ দুটো একেবারেই নিঃসম্পর্কিত হতো তা হলে সাহিত্য জগতে এই দ্বন্দ্বের আবির্ভাবই হতো না। অথচ রসের ক্ষেত্রে নীতির তর্ক বহুকাল ধ'রেই চলে এসেচে। এই সম্পর্কে বৈষ্ণব-সাহিত্যের কথা মনে পড়ল। কীর্ত্তনের আসরের একজন শ্রোতা বলেছিলেন, যখন কীর্ত্তনের রসাবিষ্টতার মাঝ দিয়ে কৃষ্ণলীলার কথা শুনি তখন এক অপূর্ব্ব তন্ময়তা আসে, তখন মধুর ছাড়া আর কোনো কথাই চিত্তে জাগে না। কিন্তু সময়ান্তরে পদাবলীর ওই সব সম্ভোগ-বিলাসের চিত্র মনে কিছু না কিছু বিকার নিয়ে আসে। তখন কীর্ত্তনীয়া বলেছিলেন, 'যাঁরা রস-সাধনা করেন নি, তাঁদের পক্ষে এমন ধারা হবেই। রস-সাধনাটি নৈতিক জগতেরই ব্যাপার নয়। তাই কীর্ত্তনের আসরে যে সাময়িক

রসোপলব্ধি হয়, কীর্ত্তনের বাইরে গেলে নৈতিক মন তাকে বিকৃত ক'রে তোলে, আর নিজের নৈতিক দুর্ব্বলতার ফলে বিকৃত উত্তেজনার ফলও ভোগ করে।' আমার মনে হয় এ কথা শুধু বৈষ্ণব-সাহিত্য বলে নয়, রস নিয়ে যার কারবার তার সম্পর্কেই ও কথাগুলো সত্য।

একটা মানুষের মাঝেই দুটো ভিন্ন রকমের চেতনা রয়েচে। একটা দৃষ্টান্ত নিলেই কথাটা বোধ করি খুব পরিষ্কার হতে পারে। একটি খুব সুন্দর নারীর নগ্ন চিত্র ধরা যাক্। দেহের পরিপূর্ণ সুসামঞ্জস্য এবং গঠনের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আছে যাকে দেখে আমরা বিস্মিত না হয়েই পারি না; তাকে সুন্দর ব'লে এই যে তন্ময় হয়ে যাওয়া, এর মাঝে একটি নিবিড় রসোপলব্ধি ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু নগ্ন নারীচিত্রের বেলা আমাদের এই যে সুন্দরের রসোপলব্ধি এটি আমাদের চিত্তে কতক্ষণই বা স্থায়ী হয়ে থাকে! আমরা চঞ্চল হয়ে উঠি, আমাদের তন্ময়তা কেটে যায়, যৌন-কামনা আমাদের রসোপলব্ধিকে নষ্ট ক'রে দেয়। অথচ একটি নগ্ন শিশুমূর্ত্তি যদি আমাদের সামনে ধরা যায়, তা হলে কিন্তু আমাদের রসবোধের নিবিড়তা এত সহজে নষ্ট হয় না। কারণ সেখানে আমাদের মনে সাধারণতঃ কোনো কামনা জেগে উঠে রস-বোধের তন্ময়তাকে নষ্ট করতে উদ্যত হয় না। অথচ যদি কল্পনা করা যায়, ওই নগ্ন শিশুমূর্ত্তিটি এমন একজনের সামনে রাখা হয়েচে, যাঁর হয়ত অমনি একটি শিশুর মৃত্যুতে বা অভাবে জীবন বেদনাময়, তা হলেই দেখতে পাব যে ওই নগ্ন শিশুমূর্ত্তিটিও দ্রষ্টার মনে রস না জাগিয়ে অন্য রকমের চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলতে পারে।

কাম-প্রেমের বৈপরীত্য সম্বন্ধে বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি শ্লোক হয়ত অনেকেই জানেন যাতে বলা হয়েচে যে, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছাই কাম আর কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছাই প্রেম। আর কোনো সাহিত্যে কোথাও এমন ক'রে কাম এবং প্রেমের সীমা এবং স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হয়েচে বলে মনে হয় না। কামনার দৃষ্টিতে তাই বৈষ্ণব-সাহিত্যের একরূপ, আর প্রেমের দৃষ্টিতে সেই বৈষ্ণব-সাহিত্যেরই আর এক রূপ। আমাদের মনে শুধুই যে কাম রয়েচে তা নয়, প্রেমও রয়েচে। তাই বৈষ্ণব-সাহিত্যকে আমরা দু'দিক দিয়েই দেখতে পারি। অবশ্য ব'লে রাখা ভাল যে, বৈষ্ণব-সাহিত্য কামের দিক দিয়ে সম্ভোগ করবার জন্য রচিত হয় নি। সে-যাহোক, কাম আর প্রেমের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বলতে চেয়েছিলাম যে, কামের সঙ্গে প্রেমের যেমন একটা মূলতঃ ভেদ রয়েছে, কামের সঙ্গে রসেরও তেমনি একটা সুস্পষ্ট ভেদ আছে। বাহ্যতঃ একই ব্যাপার যেমন কামীর দৃষ্টিতে চাঞ্চল্য আনে এবং প্রেমিকের চিত্তে রসানুভূতির তন্ময়তা আনে, তেমনি একই বস্তু কামী এবং রসিকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে দাঁড়ায়। কামলোকের মানুষটি যাকে কামোদ্বোধনের সহায়ক ব'লে মনে করে, রসলোকের মানুষের নিকট তাই আবার রসবস্তু হয়ে উঠতে পারে। এই কারণেই চিত্রাঙ্গদা নিয়েও শ্লীল-অশ্লীলের বিচার সাহিত্যের ক্ষেত্রে উঠে থাকে এবং সেখানে শিল্পীকে হাঁ-না ক'রে তূষ্ণীভাব আশ্রয় করতে হয়।

মানুষের কাম কিসে জাগবে আর কিসে জাগবে না তার সীমা নির্দ্দেশ করা কি সহজ, না, সম্ভব? রসিকের বেলাও তাই। সুতরাং যদি রস-সাহিত্যকে মানুষের কামনা জাগাবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হয় তা হলে তাঁর আর সাহিত্যসৃষ্টি চলে না। এই কারণেই কামলোকের মানুষটির,—নৈতিক জগতের হিতকামীটির—অনুযোগের আর বিরাম নেই। সাহিত্যিক শিল্পী তাঁর সৃষ্টির দ্বারা মনকে রসিয়ে তোলেন, মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের উদ্রেক ক'রে পাঠক দর্শক এবং শ্রোতাকে আনন্দ দান করেন। শিল্পীর এইটুকুই লক্ষ্য—তার বেশি তিনি এক ক্রান্তিও চান না।

কিন্তু সুন্দর এবং মধুর ব'লে যা আমার চিত্তকে এই মুহূর্ত্তে তন্ময় এবং বিস্ময়াবিষ্ট করল, তা ত আমার স্মৃতির কক্ষে চিরকালের জন্যই রয়ে গেল। যখন এই সৌন্দর্য্য এবং বিস্ময়ের আবেশ কেটে যাবে তখনও সে তো আমার চেতনার কাছে একেবারে শূন্য হয়ে যাবে না। তখন এই রস বস্তুই তার ব্যাবহারিক রূপ অনুসারে আমার মনে কোনো না কোনো রকমের ভাবনা এবং বাসনাকে চঞ্চল ক'রে তুলবেই তুলবে। তখন সেই সব বাসনা কামনার উত্তেজনায় মানুষ যে পথে প্রবৃত্ত হবে সে পথের চলার

ওপরই যে মানুষটার সমগ্র জীবনের সুখ দুঃখ কল্যাণ অকল্যাণ নির্ভর করবে! তার জন্ত কি শিল্পীর মধ্যে যে মানুষ আছে—কিম্বা শিল্পী যে মানুষের বুকে বসে রস সৃষ্টি করেচেন—তার এতটুকু দায়িত্ববোধ থাকা উচিত নয়—এই কথাটিই নৈতিক মানুষের সাগ্রহ কাতর প্রশ্ন!

শিল্পী এখানে নিরুত্তর হয়ে থাকেন প্রায়ই! তিনি বলেন, ভালো প্রবৃত্তিই হোক, আর মন্দ প্রবৃত্তিই হোক, রসবোধের পথে দুটিই অন্তরায়। সৌন্দর্য্যবোধ আমাদের চিত্তকে রসের মধ্যে মগ্ন করে, কোনো প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে চঞ্চল ক'রে তোলা তার লক্ষ্যই নয়। কোনো রকমের কামনা উদ্বুদ্ধ হ'লেই শিল্পীর সৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু নৈতিক মানুষ শিল্পকে সার্থক মনে করেন যদি তা মানুষকে নৈতিক ভালোর পথে চালিত করে। নৈতিক মানুষের কাছে সাহিত্যের বা শিল্পের সৌন্দর্য্য একটা সহায়ক গুণ মাত্র, কুইনিনের গুলির ওপরকার চিনির পরদাটির মত।

নৈতিক মানুষের এই অনুরোধ এবং দাবী সাহিত্যিক শিল্পী কখনো মেনেছেন, কখনো মানেন নি। সামাজিক মানুষ হিসাবে যিনি এই দায়িত্ব বোধ করেচেন তিনি মেনেছেন, যিনি তা বোধ করেন নি, তিনি মানেন নি। তবু শিল্পীকে কিন্তু এক জায়গায় সমাজ-বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েচে। সাহিত্য যখন শিল্পী মাত্রের রসোপলব্ধির বস্তু ততক্ষণ তার কোনো দায় নেই; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সাহিত্য সমাজের বস্তু হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ যখন সে দশ জনকে আপনার আনন্দ বিলিয়ে দিতে উপস্থিত হয় তখন তাকে সামাজিক মনোভাবের হিসাব নিতে হয়। যুগে যুগে সামাজিক মনোভাবের পরিবর্ত্তন কিছু কিছু হয়ে থাকে, এ কথা সত্য হলেও কোনো একটা বিশেষ কালে সামাজিক মনোভাবের একটা বিশিষ্টতা থাকেই। ধরা যাক বর্ত্তমান কালে কোনো একটি মানব সমাজে কতকগুলি ভাব অত্যন্ত ঘৃণিত বলে বিবেচিত হচ্চে। এই সব ভাবগুলি সব কালেই এবং সব মানুষের কাছেই ঘৃণার বস্তু হতে বাধ্য এমন প্রতিজ্ঞা করা চলে না। সুতরাং বর্ত্তমান কালেও এমন একটি মানুষ হতে পারেন যিনি ওই ঘৃণার আবরণ কাটিয়ে উঠে এই ভাবগুলির মধ্যেই একটি বিশিষ্ট রসকে প্রত্যক্ষ করচেন। যদি এই মানুষটি এই কালের মানুষদের কাছে ওই ভাবগুলি নিয়ে রসসৃষ্টি করেন, তা হলে বলাই বাহুল্য যে, এ রসসৃষ্টি তাঁর নিজের কাছে যত সার্থকই হোক্ বর্ত্তমান সমাজের সামূহিক মনোভাবের কাছে তা একান্ত ঘৃণ্য বলেই কোনো রকম রসের উদ্রেক করতে পারবে না। তবে কালে কালে অসম্ভবকেও সম্ভব হতে দেখা যায়; সত্যিকার রসসৃষ্টির সঙ্গে নৈতিক জগতের কোনো অচ্ছেদ্য যৌগিক বন্ধন নেই বলেই এক এক সময় সত্যকার রসসৃষ্টি সামাজিক বিরুদ্ধতাকেও কাটিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ স্থলেই, রস সৃষ্টিকে সার্থক হ'তে হলে সামাজিক মনোভাবের অনুবর্ত্তী হতে হয়। অনাবশ্যক বিরুদ্ধতা না জাগিয়ে শিল্পী যদি বিশুদ্ধ রস সৃষ্টি করেন তা হলেই তা সার্থক হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে হয় তো কথাটা আরো একটু স্পষ্ট হ'তে পারে। যে পতিতা, সে সব রকমেই ঘৃণার যোগ্য, তার মধ্যে মনুষ্যত্ব বলে কোনো কিছুই থাকতে পারে না, তাকে মানুষ কিছুতেই শ্রদ্ধা করতে পারে না,—এমনি ধারা একটা মনোভাব আমাদের সমাজে একেবারে পাকা আসন ক'রে নিয়েছিল। এবং এই কারণেই শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বযুগের সাহিত্যে আমরা পতিতাকে নিয়ে রসসৃষ্টির একটা বিশেষ ভঙ্গী দেখতে পাই। পতিতাকে যথাসম্ভব শাস্তি না দিয়ে কোনো শিল্পীই কলম নামাতে সাহস পেতেন না। এবং পতিতাকে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ ক'রে মরতে না দেখলে আমাদেরও চিত্ত শান্ত হ'ত না। তখন আমরা ওই বিশেষ ভঙ্গীর চরিত্র-সৃষ্টিকেই সুন্দর বলতাম। কিন্তু শরৎচন্দ্র এই পতিতাকে নিয়েই আবার অন্ত রকমের রস-সৃষ্টি করেচেন; সামাজিক মনোভাবের বিরুদ্ধতাও বড় কম জাগে নি। তবু তাঁর রসসৃষ্টিই জয়ী হ'লো এবং তার ফলে সামাজিক মনোভাবও পরিবর্ত্তিত হলো। অনেকে হয় তো শেষের উক্তিটুকু বদলে বলবেন, সামাজিক মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয়েচে বলেই উক্ত রকমের পতিতা চরিত্র সৃষ্টি ক'রে রস জাগানো সম্ভব হয়েচে। সে যাই হোক্, মোটের উপর রসবোধের সঙ্গে এক জায়গায় সামাজিক মনোভাবের যোগ আছে; এ কথা স্বীকার করতে হয়।

তাতে এই কথাই বলতে হয় যে, জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টি

পরিবর্ত্তন হলে পরে আমাদের রসবোধেও একটা পরিবর্ত্তন এসে থাকে। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী চরিত্র শরৎচন্দ্রকে ব্যথিত ক'রে তোলে। যেখানে আমাদের মনে রসানুভূতি জাগে, যেখানে আমরা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি, সেখানে প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা কোনো নৈতিক ভালো মন্দের হিসাব রাখি না। এ কথা যেমন সত্য, তেমনি আবার এ কথাও সত্য যে, কোনো শিল্পীর রসটি উপলব্ধি করতে হ'লে তাঁর জীবন-সম্বন্ধে যে বিশেষ দৃষ্টি সেটিকেও স্বীকার না করলে চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র জীবন সম্বন্ধে যে নৈতিক ধারণা বা মতবাদকে তাঁর লেখায় প্রকাশ করেচেন, তার সঙ্গে সহানুভূতি (অন্ততঃ সাময়িক ভাবে) না রেখে তাঁর রসসৃষ্টিকে কিছুতেই উপভোগ করা চলে না। গ্রীক নাটকের রসকে উপলব্ধি করতে হ'লে আবার তেমনি গ্রীক নাটকে জীবন সম্বন্ধে যে-দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েচে তাকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়। রসানুভূতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের জীবন-প্রণালীকে স্বীকার করবার একটি শক্তি থাকা প্রয়োজন। বৈষ্ণব-মনোভাব নিয়ে গ্রীক নাটকের রসাস্বাদ যেমন চলে না, তেমনি আবার গ্রীক অদৃষ্টবাদ নিয়ে সেক্সপীয়রের নাটকের রসাস্বাদ চলে না। অথচ আমরা অল্পাধিক পরিমাণে সব রকমের সাহিত্যেরই রসাস্বাদ করে থাকি। এখানে আরেকটি প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রস বস্তুটি ভিন্ন-ভিন্ন জীবনপদ্ধতিকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পেলেও এ রসবস্তুটি কোনো বিশেষ নীতিধর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ নয়।

প্রশস্তি

শ্রীজগৎ মিত্র

অসীম শূন্যের বুকে কান পাতি' শুনি তব গান,—
বিশ্বের প্রথম ভাষা, হে কল্লোল, হে আদি মহান!
নিশীথের নক্ষত্র-সভায়,
জ্যোতিষ্কের জ্যোতির প্রভায়
তোমার উল্লাস নৃত্য,—থর থরে কাঁপিছে বিমান।

তোমার চরণ-ধ্বনি বিচ্ছুরিয়া কাঁপে দিক ভরে'
প্রতিটি তৃণের গাত্রে, বনানীর পল্লব-মর্ম্মরে।
নভতল কাঁপিছে কম্পনে,
যামিনীর পক্ষ বিধূননে;
সমগ্র চেতনা মোর স্পর্শে তব কাঁপে থর থরে।

বৈশাখের অগ্নি-যজ্ঞে ক্রূর হাসি হাসিছে বৈশাখী,
তোমার প্রোজ্জ্বল জটা বিশ্বগ্রাসি' ঢাকে মোর আঁখি।
অগ্নিময় তোমার নিঃশ্বাসে
শিঙা যেন বাজিছে আকাশে,—
প্রমত্ত বিধুর শিব ঘর ছাড়া হয়েছে বিবাগী।

তুমি সে উন্মাদ নট সৃজনের আদিম প্রভাতে,
তোমার নৃত্যের তালে তাল জাগে তরঙ্গ-সভাতে।
পয়োধির প্রলয়-কল্লোলে
কেতু তব দুলিছে হিল্লোলে,
তোমার আনন্দ-ধ্বনি উচ্ছ্বসিত প্রাণের প্রপাতে।

জীবন-চারণ-কবি, হে বিশ্বের আদিতম ভাষা,
অনন্ত রাত্রির রন্ধ্র ভেদিয়াছে তোমার জিজ্ঞাসা!
বিধাতার নিগূঢ়-ধেয়ানে
বাণী তব নিয়ত সন্ধানে,—
"প্রলয়ের ঘূর্ণাবর্ত্তে কোথা ঢাক সৃজন-পিপাসা?"

তোমার বন্দনা-গানে সেই কবে জাগিল চেতনা—
উত্তাল বারিধিবক্ষে কোটি কোটি প্রাণবাহী কণা!
নিশীথের ভেদিয়া নির্ম্মোক
সৃজনের প্রথম আলোক
উষার কিশোর প্রাতে উদ্বোধিল শ্যামল-বেদনা।

তোমার উদাত্ত ভাষা সেই ক্ষণে হয় নি নিঃশেষ,
নারদের বীণাযন্ত্রে, হে কল্লোল, তোমার উন্মেষ।
সপ্ত স্বর তোমার সন্ততি
কলকণ্ঠে জানায় প্রণতি,
তোমার গমন-পথ নির্দ্ধারিল প্রাচীন মহেশ।

সাগর-মন্থন-লীলা আজি আমি ধ্যানচোখে হেরি,
তোমার বোধন-গানে নিনাদিত আকাশের ভেরি।
সিন্ধুবক্ষে জাগিছে কমলা
শাপহতা মোহিনী চঞ্চলা—
পিযুষ-মঞ্জুষা হাতে—সুরলোকে সহে না ক' দেরি।

আজি সে তোমার নান্দী স্বর্গে মর্ত্ত্যে হ'ল একাকার,
চঞ্চরীর গুঞ্জরণে মঞ্জরিত মরম আমার।
প্রাচীনের পুরশ্চরণে,
কোকিলের কোমল নিস্বনে,
মাধব-ময়ূখ-চক্রে নূতনের স্বাগত ওঙ্কার।

যুগে যুগে নবীনের নব নব বিজয়-যাত্রায়
তোমার তূর্য্যের ধ্বনি বীর্য্যহীনে জীবনে মাতায়।
ভাঙনের ভীষণ বিদ্রোহে
সৃজনের নবনদী বহে,
বজ্রাহত জীর্ণ তরু জয় গাহে চিকণ পাতায়।

প্রলয়-সৃষ্টির মাঝে তুমি চির-মিলন-ঝঙ্কার;
আগম নিগম ঋক্, হে কল্লোল, লহ নমস্কার। *

---

*. কল্লোলের নূতন প্রচ্ছদ-পট দেখিবার বহু পূর্ব্বে কবিতাটি রচিত— লেখক

স্বাগত

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

গ্রামের শেষে নদীর মুখ; এবং তাহারই অদূরে রায় বাবুদের প্রকাণ্ড চালের কল। গর্জ্জন ও আস্ফালন শুনিয়া মনে হয়, অসভ্য পল্লীটিকে দুরন্ত না করিয়া ছাড়িবে না। ইহারই দৌলতে মাঠের ধান আজ ঢেঁকিতে উঠিবার সুযোগ পায় না, মিহি ছাটাই হইয়া দেশ-দেশান্তে চলিয়া যায় এবং গ্রামের এই শস্য-সম্পত্তিকে যাহারা সভ্য ও সুচিক্কণ করিবার ভার লইয়াছে তাহারা গ্রামেরই লোক;—পুরুষ ও নারী।

পল্লীর অনাড়ম্বর সহজ জীবন-প্রবাহকে ইহারা কল-কারখানার মতই জটিল ও ধোঁয়াটে করিয়া লইয়াছে। আ-সন্ধ্যা পরিশ্রমের পর অদূরবর্ত্তী উপীনচন্দ্রের দোকানঘরে বসিয়া এক চুঙ্গী 'পচানি' গলায় না ঢালিলে সন্ধ্যাটা ইহারা অপব্যয় মনে করে, পান-পাত্রের সঙ্গে মাদল-মৃদঙ্গের বোল না মিশিলেও উৎসব অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

মেয়েদের মধ্যে পরী ও রাসমণির এখানে নিত্য উপস্থিতি আছে। মা ও মেয়ে।

রাসমণির বয়স হইয়াছে—লোলচর্ম্মের দৌরাত্ম্যে সর্ব্বাবয়বের উল্কি-চিহ্নগুলি কিছু অস্পষ্ট। পরীর বয়স অল্প, গড়নটিও ছিমছাম। সেই দুর্দ্ধর্ষ পান-তন্ত্রের সে-ই একমাত্র অনভিষিক্তা মহারাণী। সকলের পান-পাত্রে একবার করিয়া ওষ্ঠ-স্পর্শ ও সকলের কণ্ঠদেশে অন্ততঃ একটিবার বাহুবেষ্টন ছাড়া দ্বিতীয় কোন কর্ত্তব্য তার নাই, এবং ইহাও ঠিক যে, ইহাতে কেহ কাহারো প্রতি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট বা ঈর্ষান্বিত হয় না!—এটুকু ঔদার্য্য ইহাদের আছে।

এমনি দিন কাটিয়াছে অনেকগুলি। নিশীথ-উৎসবে নিত্য-নূতন অতিথির সম্বর্দ্ধনা করিয়া একদিনও তার ক্লান্তি আসে নাই। কাম-কলরোলে প্রতিটি রাত্রি বিনিদ্র জাগিয়াও কারখানায় কোনো দিন কেহ তাহাকে ঢুলিতে দেখে নাই … এমনি সে!—

যেন আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রমালার একটি চাঁদ, অসংখ্য পঙ্কজের একটি সূর্য্য।

সে দিনটা বোধ করি হপ্তার মুখ। আকাশ সকাল হইতেই মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। খোদ কর্ত্তা সঙ্গে করিয়া একটি আঠারো উনিশ বছরের ছেলেকে বয়েলারের কাছে খাড়া করাইয়া দিয়া গেলেন।

ছেলেটির ভাব-ভঙ্গীমায় স্পষ্ট বোঝা গেল, কাজ করা দূরে থাকুক, এমনি বিস্ময়কর, অভূতপূর্ব্ব জিনিষ সে ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখেও নাই।

ডাগর দুটি চোখে সে কী অপরূপ বিস্ময়, অননুভূত অনুভূতি!—

সে যেন তার চোখের দুয়ারে এক অনাবিষ্কৃত মহাদেশ, অশ্রুত মহা-রাগিণী!

ছিরু ত' হাসিয়াই খুন!

ঘাড় ঘুরাইয়া বলিল, ভূত …

কৃষ্ণকালীর জন্মাবধিই একটি ঠ্যাং অপরটির চেয়ে বহরে কিছু বড়, এ কারণে কারখানা-অঞ্চলে তাহার ঠ্যাং-কালী নামেই প্রসিদ্ধি সমধিক।

ঠ্যাং ছিরুর ভ্রম-সংশোধন করিয়া কহিল, ভূত নয় রে, জংলী—যেন ভূত দেখেচে!

ছিরু ছেলেটির দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, তোমার নামটি কি বাবা-চাঁদ?

ছেলেটি একটিবার তার মুখের উপর পূর্ণায়ত দৃষ্টি মেলিয়া কহিল, কেন? আমার নাম ছিমন্ত।

এমনি সময় পরী চলিয়াছিল ঠিক সেই ধার দিয়া এক ধামা তুঁষ মাথায় লইয়া। সে দিকে দৃষ্টিপাত হইতেই ঠ্যাং চীৎকার করিয়া উঠিল, এই মাগী শুন্‌চিস—ছোঁড়ার নাম ?—বলে ছিমন্ত। বেশ, ছিমতী হ'লেই ত' খাসা হ'ত !

শ্রীমন্ত কি জানি কেন, কিছু একটা সহানুভূতি প্রত্যাশা করিয়া পরীর মুখের পানে চাহিল এবং সেই মুহূর্তে পরীও সশব্দ হাস্যে কক্ষ অনুরণিত করিয়া বলিল, বটে ? তা বেশ। দন্তমাণিক নয় ত !

পরীর কথায় ছিরু ও কালীর হাসির তুবড়ি একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। আর যাহাকে লইয়া এত হাসাহাসি, এত বিদ্রূপ—সেই শ্রীমন্ত না কহিল একটি কথা, না দিল উত্তর, শুধু নিঃশব্দ অশ্রু-সঞ্চয়ে চোখের পাতা দুটি ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিল। ···

ঠ্যাং কহিল, কি দেখচিস ওর মুখপানে চেয়ে, ও পরী !

পরী যেন এতক্ষণ অন্য কোথাও ছিল ! সচকিত হইয়া কহিল, দেখচি ছোঁড়ার কাণ্ডখানা ! ··· কেঁদে ভাসালে !

সত্যই, বিদ্রূপের উত্তরে শুধু কাঁদিতে জানে এমন ব্যক্তি সে অনেক কাল দেখে নাই !

এ যেন নূতন কিছু !

একটা বিস্ময়, বা—

শ্রীমন্তর চোখে জলটা যেমন—!

তুঁষের বোঝা মাথায়, চলিতে চলিতে পরীর মনে হয়, অতখানি সশব্দে হাসিবার সত্যই কোনো প্রয়োজন ছিল না ! এ যেন অন্যায় !

হয়ত নিতান্ত কারণহীন অনুভূতি !

বাহিরে আসিয়া আকাশের উদ্দেশে চাহিয়া আজ তার সর্ব্ব প্রথম মনে হইল, ও যেন অর্থহীন নয়, শূন্য নয় !

শ্রীমন্তর চোখের অনুদ্‌গত অশ্রুর মত কি একটা যেন ওর সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিয়া আছে।

তারপর—

এত বড় বিস্ময় নাকি তার ছিল না ! ঘুরিয়া আসিয়া পরী বলিল, আনাড়ী মানুষ, হাতে ধরে তোরা একটু শিখিয়ে দিস—নইলে পারবে কেন ?

ঠ্যাং কহিল, ওকে কে আসতে বলেছিল ?

পরী বলিল, কি জানি। তা বলে ও শিখবেও না ? তোরাও ত একদিন এমনি ছিলি !

কিন্তু কাদেরই বা সে কথা বুঝান !

ছিরু বলিল, হাসাস নি মাইরি ! কাজে যা ...

পরী কাজে গেল। এবং প্রথমত সন্ধ্যার পর উপীনের দোকানে মজলিশও বসিল, গান-বাজনাও চলিল।

কিন্তু সব যেন আজ অর্থহীন, ছন্দ-ছেঁড়া !

যেন মধ্য-দিনের বেহাগের আর্ত্তনাদ !

বাড়ী ফিরিয়া শুনিল মায়ের অসুখ, ঘাটের পথে পা পিছলাইয়া মাথায় চোট্ লাগিয়াছে—সঙ্গে প্রবল জ্বর এবং বিকারের লক্ষণ।

সে রাত্রে অনেকেই রুদ্ধ দ্বারের বাহির হইতে ফিরিয়া গেল—হতাশায় !

পরী ভাবিল, সে মুক্তি পাইয়াছে—যেন শতবর্ষের অন্ধকার কারাবাসের পর। এই মা-ই একদিন হাতে ধরিয়া তাহাকে সব কিছু বুঝাইয়া ও দেখাইয়া দিয়াছেন, আজ তাঁরই পীড়ার অজুহাতে শুধু একটি দিনের ছুটি ···

কিন্তু শুধু কি তাই !

শ্রীমন্তের অশ্রুমলিন মুখটিও ত কতবার এই ম্লান দীপালোকে তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

তাই বা কেন ?

কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পরী দেখিল, আজ এমন একটা লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হইয়াছে, যে যাচিয়া তার গায়ে ঢলিয়া পড়ে নাই, ঢং করিয়া ছুটো রসভাষ শুনাইবার চেষ্টা করে নাই ! যাহাদের সে এতকাল দেখিয়াছে, কাছে পাইয়াছে, এ তাদের হইতে একেবারে স্বতন্ত্র, সরল !

পরদিন। সন্ধ্যার আবছায়া তখন নিবিড় হইয়াছে।

দিনান্তের পরিশ্রম শেষে সবাই তখন উপীনের দোকানে।

নল-কূপের ধারে বসিয়া শ্রীমন্ত তখন মুখে জল দিতেছিল।

পরী আসিয়া হাজির !

কহিল, এখনো ঘর যাও নি ?

এমন সুস্নিগ্ধ, শান্তস্বর সে জীবনে শোনে নাই। দুই চোখে প্রীতি ভরিয়া উত্তর দিল, না, এই যাই।

ভিড় থাকতে এগোতে পারো নি?

শ্রীমন্ত হাসিল, কহিল, হ্যাঁ, তাই। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

পরী বলিল, চল তোমার সঙ্গে যাই।

কোথায়?

ভয় নেই। ঘর অবধি নয়;—পথটুকু।

খুসীতে মুখ উজ্জ্বল করিয়া শ্রীমন্ত বলে, তাতে কি। চলো না।

অন্তরে আনন্দের মত্ত-স্রোত ছুটাছুটি করে।

জনহীন পল্লীপথ। আঁধার-ঢাকা গাছের ডালে পাখীর কলরব; বাতাসে বনফুলের গন্ধ। পাশের দীঘির পরপারে কাদের কুটীরবিচ্ছুরিত ক্ষীণদীপশিখা—যেন স্বপ্ন-মায়া।

কথা-বার্ত্তার ফাঁকে দীর্ঘপথ যেন নিমিষে নিঃশেষ হইয়া যায়।

পরী জিজ্ঞাসা করে, কার কাছে থাকো?

পিসের কাছে।

বাপ-মা—?

নেই।

এখানে কি করে এলে?

বাবুদের বাড়ী পিসের ঢের দিনের চাকরী—তিনিই বলা-কওয়া করে—

পরী সহানুভূতিসূচক একটা কিছু বলিতে গিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া যায়। মনে পড়ে, বিগত দিনের সব্যঙ্গ উক্তি ও উচ্ছৃঙ্খল হাসি!

অপরাধীর মত সঙ্গে সঙ্গে যায়। তারপর বলে, আসি এবার—

শ্রীমন্তদের ঘর তখনো খানিক দূরে।

শ্রীমন্ত দাঁড়াইয়া পড়িল। কতক্ষণ অকারণেই চুপ করিয়া থাকে। তারপর অন্তর হইতে অনেকখানি শক্তি-সঞ্চয় করিয়া বলে, এসো।

পরীর পথচলা তখন সুরু হইয়াছে।

মনে হয়, পিছন হইতে কে যেন হাতছানি দিয়া ডাকে, কানে কানে কথা কয়।

যেন ধূ ধূ মরুর ঊষর হৃদয়ে ঊর্দ্ধ-আকাশে সঞ্চারমান নীল-মেঘের ছায়া পড়ে।

উপীনের দোকানে সেই প্রথম অনুপস্থিতি।

রাত্রে ছিরু আসিয়া ডাক দিল।

আজ আমার পালা।

পরী বলিল, ব্যাটা মারি। … না, না, বিদেয় হও …

কেন বল্ দিকিন? উপীনের দোকানেও যাই …

না, যাই নি। মায়ের অসুখ। এখন এসো—

অগত্যা ছিরু ফিরিয়া গেল।

পরী মায়ের শিয়রে আসিয়া বসিল। কিন্তু ঘুম আর আসে নাই!

মনে হয়, এত হাসি, এত রঙ্গ, এত লোকের মাঝে কে যেন—সে যেন আসে নাই!

জীবনের এতগুলি বর্ষ ও দিন, দিন ও রাত্রি বৃথাই গিয়াছে!

অপচয়! অপচয়!

আপনাকে বহুর মধ্যে প্রচার করা হইয়াছে সত্য, প্রতিষ্ঠাও মিলিয়াছে সকলের মধ্যে, কিন্তু …

নিজে সে শূন্য!

তাহার আপনার মাঝে কাহাকেও প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই।

এতখানি সৌন্দর্য্য, এতখানি প্রতিষ্ঠার মাঝে সে একা!

পরদিন কারখানায় এক কাণ্ড!

মেশিন অয়েলের টিন ও চুঙ্গী রাখিয়া শ্রীমন্ত নিমিষের জন্য একবার বাহিরে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া দেখে সেগুলি নাই!

নূতন কর্ম্মী, এখনও এক সপ্তাহও হয় নাই, … কি করিবে সে?

একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্রীমন্ত নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

ঠাং কহিল, কাঁদো কেন হেমতী? হোল কি?

যেন কিছুই তার জানা নাই!

শ্রীমন্ত বলিল, তেলের টিন্‌টা—

সবাই হাসিল—যে যেখানে ছিল!

বলি কম্ম করা কি সহজ কথা! এমন মেয়ে-মানুষের শরীর নিয়ে—

কেহ কেহ সহানুভূতির কথাও বলিল। বলিল, চাকরী যাবে—

ঐ পর্য্যন্তই, আর কিছু না!

যে যার কাজে মন দিল। যেন কিছুই হয় নাই।

শ্রীমন্ত নতনেত্রে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। চলন্ত কলের গর্জ্জন শুনিয়া মনে হইল, কে যেন উন্মত্ত-কণ্ঠে বার বার-কৃত অপরাধের জন্ত ভর্ৎসনা করিতেছে।

কি জানি কেন এই অসহায় মুহূর্ত্তে পরীকেও মনে পড়িল বহুবার। আজ সে আসে নাই।…

পরিচয় তাদের নিবিড় হইবার সুযোগ পায় নাই সত্য, সে কি, সে কেমন—তাও সে জানে না, তবু মনে হয়, সে থাকিলে আজ একটা উপায় হইত।

যুগ্মশুকতারার মত স্বচ্ছ চোখ দুটিতে কাল যেন তাহারি আভাষ মিলিয়াছিল।

ক্রমে কথাটা কর্ত্তাও শুনিলেন, ডাকও পড়িল।

বলিলেন, অল্পকথায় কাজটুকু পেলে, তাই কাজে এমনি অবহেলা। সপ্তাহের রোজ পেলে তেলের দাম আমি কেটে নেব। যাও—

আদেশ অমোঘ এবং সংক্ষিপ্ত। প্রতিবাদের ভাষা মুখে আসিল না। শ্রীমন্ত নিঃশব্দেই ফিরিয়া গেল।

সপ্তাহ শেষ হইল। যে যার পাওনা বুঝিয়া লইয়া উপীনের দোকানের দিকে চলিল। যাইবার সময় কেহ বা মুঠার মধ্যে টাকা বাজাইয়া শ্রীমন্তকে ব্যঙ্গ করিয়া গেল, কেহ বলিল, পাছে পড়ে কেন গো, সঙ্গে চলো, একপাত্র দেব'খন—মাগনাই।

শ্রীমন্তর ডাক পড়িল না।

রাত্রে পিসে জিজ্ঞাসা করিল, টাকা কই রে?

কতক্ষণ নতমুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শ্রীমন্ত কহিল, টাকা পাই নি।

এক সপ্তাহ হইতে পিসে এই দিনটির প্রত্যাশায় ছিল। সংবাদ শুনিয়া গর্জ্জন করিয়া কহিল, কেন, পেলি নি কেন, শুনি?

শ্রীমন্ত বলিল, তেলের টিন হারিয়েছিলুম—তাই—

পিসে একেবারে যেন ফাটিয়া উঠিল।

হারাল কি করে? হারামজাদ শূয়ার! … এত কচি খোকাটি নও যে, খামোখা টীনটাই লোপাট হয়ে যাবে! … ঠিক করে বল্—বদমাইসি কি না?

শ্রীমন্ত কহিল, না—

কিন্তু এতটুকু সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রত্যয় জন্মানর পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাই পিসে কহিল, ছেলেভুলুতে এসেচিস? আমি কিছু বুঝি নি, না? … কাল সন্ধেয় পরাকে সঙ্গে নিয়ে তুই ইদিক পানে আসিস নি?

শ্রীমন্ত কহিল, এসেছিলুম। তাতে কি?

তাতে কি! … পিসে আর সহ্য করিতে পারিল না। সবেগে শ্যালক-পুত্রের গালে এক চড় হাঁকড়াইয়া দিয়া বলিল, তাতে কি! … বটে! … এতকাল বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ালাম … তার ওপর জবাব করা! … ও সব নেটোপনা চলবে না। বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে …

শ্রীমন্ত বলিল, কেন? এতরাত্রে কোথায় যাব?

জানি না; যে চুলোয় ইচ্ছে।—বলিয়া পিসে ঘাড়ে ধাক্কা দিল। …

পল্লীর পথ। সন্ধ্যার পরই পথ চলাচল বন্ধ হইয়া গেছে। শ্রীমন্ত আসিয়া দাঁড়াইল সে জনহীন পথে। কোথায়,

কোন্ পথের উদ্দেশে পা-দু'টাকে সে টানিয়া লইয়া যাইবে? কতদূরে? কার কাছে?

অপরাধ তার এমনই বা কি গুরুতর! যার জন্য এই এতবড় শাস্তি। আকাশে কি ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই! সে কি এই ধূলা-মাটীর পৃথিবীর মানুষের চেয়ে ছোটো, হীন? কিম্বা সে এক খেয়ালী—যার উন্মাদ কামনার ফলে জন্ম লইয়া ধরণীর শিশু-সন্তানের দল পদে পদে মৃত্যুর উদ্দেশ্যে আগাইয়া চলিয়াছে। সে কী মানুষের চেয়ে অন্ধ, বুদ্ধি বিবেচনাহীন? নহিলে তাহার এতকালের শান্তি-নীড় আজ এমনি করিয়া একটি অতি তুচ্ছ কারণে ভাঙিয়া যাইবে কেন?

মানুষকে যদি সুখ দিবার, শান্তি দিবার ক্ষমতা তার নাই, তবে নিরর্থক তাদের সৃষ্টি করিয়া তার লাভ কি?

উঃ! … এমন করিয়া সে আর কখনো ভাবে নাই! অভিমানে, ব্যথায়, আক্রোশে তার দুই চোখ প্লাবিয়া জল ঝরিতে থাকে! ভাবে, ঈশ্বর সৃজিত এই বিরাট খেলাঘরে মানুষ খেলেনার চেয়ে বড় কিছু নয়!

রাত্রি তখন মাঝ-সীমা পার হয়।

মুমূর্ষু মায়ের শিয়রে বসিয়া পরী তখন ঢুলিতেছিল।

এ ক'দিন সে কারখানায় যায় নাই। সদর হইতে চিকিৎসক আনাইয়া না দেখাইলে মায়ের বাঁচিবার আশা বড় কম। অথচ ঘরে পয়সা নাই, কলসীতে চাল নাই। দিন আনিয়া দিন খাইয়া বেশ সুখেই এত কাল কাটিয়াছে, আজ …

সন্ধ্যার কিছু পরে ছিরু আসিয়াছিল, এমন কি মুসলমানদের সেই রসুল পর্য্যন্ত! কিন্তু রাজী কেহ হয় নাই। আজিকার রাত্রির জন্য পরী প্রত্যেকের কাছে একখানা নোট চাহিয়াছিল।

অসম্ভব এবং অন্যায় প্রার্থনা—পূরণ হয় নাই।

রসুল বলিয়াছিল, বুঝতে কি আর পারি না পরি বিবি … মন যে এখন অন্যের কাছে বাঁধা, তাইতেই আমাদের এমন করে অপমান। কিন্তু, এতকাল বিবিজান আমরাই চালিয়ে এসেছি—

পরী উত্তর দিয়াছিল, জানি, আমিও এতকাল নিজেকে সবাই করে এসেচি … কিন্তু আর না, আজই এর শেষ। আজ যে থাকবে তার কাছে দশটি টাকা আমার চাই … ওর একটি পাই কমে না। রাজী না হও বাড়ী যাও, মায়ের বাড়াবাড়ি অসুখ।

রাজা কেহ হয় নাই।

পরীও কথার খেলাপ করে নাই.

ফিরিয়া গিয়াছে—সবাই।

তার পর, রাত্রি তখন নিস্তব্ধ, নিঃসাড়—

তরু-পত্রের মৃদু মর্ম্মরটুকুও স্পষ্ট শোনা যায়।

ক'দিন কলে কামাই হইয়াছে, তার জন্য মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি জাগে।

হয়ত শুধু সেই কারণেই নয়!

বাতাসের গোঙানী শুনিয়া মনে হয়, ও যেন এক অনাগত অদেখা শিশুর ক্ষীণ আর্ত্তনাদ!

শূন্য কোলের দিকে চাহিয়া পরীর দু'চোখে জল ভরিয়া ওঠে।

এমনি সময় বাহিরে কাহার ডাক

পরী আছ?

কণ্ঠস্বর যেমন প্রত্যাশিত নয়, তেমনি খুব বেশী পরিচিতও নয়। যেন কতকাল আগে, অচেতন তন্দ্রার ঘোরে কবে একবার শোনা গিয়াছিল।

মায়ের মাথাটি কোল হইতে নামাইয়া, রাখিয়া বাহিরে আসিয়া পরী দেখিল —

শ্রীমন্ত।

আপনার অজ্ঞাতেই কণ্ঠস্বরে যেন সুর-তরঙ্গ খেলিয়া গেল। কহিল, তুমি? এত রাত্রে? …

শ্রীমন্ত যেন বোবা হইয়া গেছে। কথা বলিতে পারে না।

পরী মনে মনে বলে, এরা সবাই এক।

রূপের ভিখারী, লালসার দাস—সবাই।

ছিরু এবং এর মধ্যে তফাৎ কোথায়?

তবে ? …

সে তবের উত্তর সহজে মেলে না। শ্রীমন্ত তেমনি আনতনেত্রে দাঁড়াইয়া থাকে। বলিতে পারে না, তোমার দেহের দুয়ারে আসি নাই, আসিয়াছিলাম …

পরীর দু চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চায় !

একটা অভ্রস্পর্শী গিরি-চূড়া, একটা মহান আদর্শ, মহতী কল্পনা যেন আজ চোখের সামনে গুঁড়াইয়া ধুলা হইয়া গেছে !

অন্তরের দুর্ব্বার ক্রন্দনকে প্রাণপণে নিরুদ্ধ করিয়া পরী বলিল, শেষ তুমিও ! … ছি !

অনুযোগের কারণ শ্রীমন্ত কিছু বুঝিল না। বলিল, আমায় থাকতে দেবে ? পিসের কাছ থেকে চলে এলাম।

বিস্ময়ে পরী আত্মহারা হইয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

শ্রীমন্ত বলিল, তাড়িয়ে দিলে।

কেন ?

কাঁদিয়া, ফুলিয়া শ্রীমন্ত তখন সব কথা পরীকে জানাইল।

শুনিয়া পরী নতমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল … তারপর বলিল, টাকার জন্যেই এত কাণ্ড ত ? … তা' তোমার পিসেকে বলো, কাল তিনি টাকা পাবেন।

শ্রীমন্ত বলিল, সেখানে আর আমি যাব না। তুমি যদি …

পরী বলিল, ছিঃ ! এ কি তোমার থাক্‌বার জায়গা !

শ্রীমন্ত কহিল, কেন ? তোমারি কাছে যে এসেছিলাম।

তা হোক্। টাকা পেলেই তিনি শান্ত হ'বেন। … তুমি ছিরুকে চেনো ? তার বাড়ী, না হয় উপীনের দোকানে গেলেই পাবে। তার সঙ্গে দেখা ক'রে বলবে, আমি তাকে ডেকেচি।

শ্রীমন্ত কহিল, আর কিছু না ? যদি শুধোয়, কেন ?

বলবে, যা দেবে বলেছিলে, তাই দিলেই হবে। … বুঝলে ?

শ্রীমন্ত কহিল, হ্যাঁ।

তার পর চলিতে সুরু করিল।

পরী বলিল, শোন। … খাওয়া হয়েচে ?

শ্রীমন্ত বলিল, না।

আঁচল হইতে শেষ সিকিটি খুলিয়া শ্রীমন্তের হাতে দিয়া পরী বলিল, এটি নিয়ে যাও। বাজারে কিছু কিনে খেয়ো। আর, লক্ষ্মীটি, এখানে থাকতে দিলুম না ব'লে দুঃখ করো না। তোমায় এখেনে থাকতে নেই তাই, বুঝলে ?

শ্রীমন্ত বলিল, হ্যাঁ। …

পরী কণ্ঠস্বর উঁচু করিয়া বলিল, ছিরুকে পাঠিয়ে দিতে ভুলো না। … আর কাল এসে টাকা নিয়ে যেয়ো। …

শ্রীমন্ত কথা বলে না, চলিতে সুরু করে।

অনিমেষ শুষ্ক নেত্রে পরী সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকে—পাথরের মত।

কতক্ষণ গেছে কে জানে !

ছিরু আসিয়া হাজির।

মুখে দিশি সুরার উৎকট গন্ধ, মাথায় ফেট্টি-বাঁধা রঙীন রুমাল। বলে, বেটাইম তলব যে—?

পরী যেন মরিয়া গেছে—অসাড়, মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারে না।

ছিরু বলে, মান করলে নাকি বাবা ! ডেকে পাঠিয়ে শেষ … কিন্তু তোমারি কাছে এলাম যে বিবিজান ! …

পরীর অন্তরে হঠাৎ যেন ভূমিকম্পের হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায়।

তোমারি কাছে এসেছিলাম ! তোমারি কাছে এসেছিলাম !

আরও একজন বলিয়াছিল—এমনি কথা।

সে ফিরিয়া গেছে।

হাত বাড়াইয়া ছিরু বলে, কই হাত বার করে কাগজখানা নাও না ভাই ! মিছে রাগ কেন ?

যন্ত্রের মত একটা হাত বাড়াইয়া পরী ছিরুর দেওয়া পাঁচ টাকার নোটখানা গ্রহণ করে।

ছিরু বলে, চলো ঘরে চল, … বাইরে দাঁড়িয়ে লাভ কি !

বহুক্ষণ কাটিয়া যায় মনে মনে।

ঘরে যেন মানুষ নাই এমনি স্তব্ধ!

বিস্মিত ছিরু অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, পরীর মুখে।

তার পর—

লালসালোল একখানা হাত বাড়াইয়া সোহাগ করিতে যায়…

ভূতে পাওয়ার মত পরী উঠিয়া দাঁড়ায়।

পায়ের কাছে নোটখানা ছুঁড়িয় দিয়া বলিয়া ওঠে, যাও, ওঠো…

বলার সঙ্গে দু'চোখ বহিয়া তার অজস্র ধারায় জল ঝরিয়া পড়ে। বিভ্রান্ত হইয়া ছিরু বলে, যা হোক্ মাইরি, ঢের রঙ্গই দেখালি! রাত দুকুরে ডেকে এনে…

পরী একেবারে উপুড় হইয়া পড়ে ছিরুর পায়ের কাছে।

আকুল কণ্ঠে অনুনয় করিয়া বলে, তুমি যাও… তুমি যাও!… ও ভুল, ও ভুল,… ও আমি পারি না আর।…

ভোরের হাওয়া যেন আকাশ-পারের বার্ত্তা বহিয়া ছুটাছুটি করে।

মুমূর্ষু মায়ের শিয়রে বসিয়া মেয়ে কত কি ভাবে।—

ছিরু ফিরিয়া গেছে, আর সে নিজেকে দলিত করিতে পারে নাই।

শ্রীমন্তকে প্রতিশ্রুতি দিয়াও না।… হয় ত শ্রীমন্ত এখনি টাকা নিতে আসিবে।

শ্রীমন্তের ভীষণ বিপদ হইলেও ঐ টাকা সে শ্রীমন্তকে হাতে তুলিয়া দিতে পারে না।

তবু তাহার মনে হইতেছিল, সে যেন একা নয়। আরো মানুষের সঙ্গ সে পাইয়াছে।

শ্রীমন্ত সত্য সত্যই আসিয়া ফিরিয়া গেল।

যাক্ সে আজ ফিরিয়া—কিন্তু যে শ্রীমন্ত তাহার দেহ ও প্রাণকে নূতন চেতনা দিয়া জাগাইয়া গেল, সে শ্রীমন্ত ফিরিয়া যায় নাই—সে ফিরিয়া যায় না!

উপন্যাস

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

২

গোপিকারমণ বসুরা পুরুষানুক্রমে জমিদার। তাঁর পিতামহ ছিলেন বৈষ্ণব। তাই ছেলে ও নাতির নাম দিয়াছিলেন যথাক্রমে রাধারমণ ও গোপিকারমণ।

পিতার মৃত্যুর পর মাসখানেক ফিরতে না ফিরতেই রাধারমণ একেবারে তাঁর জীবনের ভোল্ বদ্‌লে ফেল্লেন। পিতার জীবনকালে এতদিন ধরে যে সব জলচর, ভূচর ও খেচর প্রাণীকে তিনি মনে মনে আহার কোরে এসেছেন এবার সেগুলি বিভিন্ন আহার্য্যের রূপ ধরে তাঁর থালার চারিদিকে শোভা পেতে লাগ্‌ল। তা ছাড়া, রাধারমণের ছিল ইংরেজদের খোসামোদ করবার সখ। ইংরেজ পেলেই তিনি তাকে নিজের বাড়ীতে নেমন্তন্ন কোরে এনে খাওয়াতেন। এ সম্বন্ধে তিনি তাদের পদ-মর্য্যাদার বাছবিচার করতেন না। কমিশনার থেকে আরম্ভ কোরে পি. ডব্‌লিউ. ডি-র রোলার ইঞ্জিনের ড্রাইভার পর্য্যন্ত সকলকেই তিনি সমান তালে সেলাম ঠুকতেন। তাঁর আমোলে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন বাড়ীতে ইংরেজদের খানাপিনা চল্‌ত। বাড়ীর একটা দিক তিনি ইংরেজী কেতায় সাজিয়ে ছিলেন। সে দিকে বাড়ীর অন্য কারুর পা দেবার হুকুম ছিল না।

রাধারমণের পুত্র গোপিকারমণের হোলো ইংরেজ হওয়ার সখ। বাপের শ্রাদ্ধের পর নেড়া মাথায় চুল গজাবার আগেই তিনি বিলেত যাত্রা করলেন। সেখান থেকে ফেরবার পর বাড়ীতে টেবিলে খাওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত হোলো। কয়েক-মাস যেতে না যেতে একটি ইংরেজ গভর্ণেসও এসে জুটল। কিছুকাল এইভাবে কাটবার পর পত্নীর একান্ত আগ্রহে এবং নিজের অত্যন্ত অনিচ্ছায় গবর্ণেসটিকে বিদায় দিতে হোলেও টেবিলে খাওয়ার রীতিটা সেই থেকে বাড়ীতে স্থায়ী হোয়ে গিয়েছে।

টেবিলে বসে খাওয়া হোতো বলে যে, খাদ্যগুলো একেবারে ইংরেজী ছিল তা নয়। রাধারমণ নিজে ছিলেন ভোজনবিলাসী এবং বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াতে তিনি ভালবাসতেন। কাজেই ইংরেজী, বাংলা, উর্দ্দু-ফারসী, ফরাসী-ইতালীয় প্রভৃতি মিলিয়ে আহার্য্যের তালিকাটি হোতো বিরাট এবং বিপুল। পত্নীর কড়া শাসনে পয়সা ওড়াবার অন্য কোনো পথে পা দেবার সুযোগ রাধারমণের অদৃষ্টে খুব কমই জুটত। সেইজন্য, বাড়ীতে পান-ভোজনের অভাবে স্বামীটির যাতে চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে সেদিকে তাঁর পত্নীর খুব প্রখর দৃষ্টি ছিল।

গোপিকারমণের একমাত্র বংশধর কল্যাণ এখানে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার পরই তাকে বিলেতে পাঠিয়ে

দেওয়া হয়েছিল। ছেলে বিলেতে যাবার কয়েকমাস পরেই গোপিকারমণ আর একবার ইউরোপটা ঘুরে আসবার সংকল্প করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ কয়েকদিনের অসুখে তাঁর স্ত্রী হিমানী ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর গোপিকারমণের গৃহ একেবারে শূন্য হোয়ে গেল। বাড়ীতে ঝি, চাকর, সরকার, দরোয়ান সবই আছে কিন্তু একজনের অবর্ত্তমানে সবই যেন বিশৃঙ্খল। তাঁর ছোট ছোট মেয়ে দুটি ইলা ও বেলাকে দেখবার কেউ নেই। তাদের কাপড়-চোপড় ময়লা, সময়ে তাদের খাওয়া হয় না। ঝি-চাকরে তাদের সামলাতে পারে না। মেয়েদের এই অবস্থা দেখে গোপিকারমণের বোনেরা এসে তাদের নিয়ে গেলেন। কিন্তু মেয়েদের কাছ ছাড়া কোরে তিনি যেন আরও অসহায় হোয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনি একজন উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর খোঁজ করতে লাগ্‌লেন। কিছুদিন পরে জয়াকে মেয়েদের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত কোরে তিনি মেয়েদের বাড়ীতে নিয়ে এলেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর গোপিকারমণের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়ার উৎসব একরকম বন্ধই হোয়ে গেল। টেবিলে খাওয়া হোতো বটে কিন্তু টেবিলের আর সে মর্য্যাদা রইল না। খাবার সময় একদিকে বসতেন তিনি আর একদিকে বস্‌ত জয়া। একদিকে ইলা ও অন্যদিকে বেলা। যেখানে একদিন গল্প হাসি, স্যাম্পেন ও হুইস্কির হল্লোড় চল্‌ত সেখানে এখন অতি মামুলী ওজন করা দুটো চারটে কথা, ইলা ও বেলার দু-একটা শিশুসুলভ প্রশ্ন,—এ ছাড়া কিছুই হোত না। বাড়ীতে পুরোনো দিনের অতিথি-অভ্যাগত কেউ এলে এই নিয়মের সামান্য একটু ব্যতিক্রম হোতো। সে সময়ে জয়া ও মেয়েরা টেবিলে বস্‌ত না, আর সন্ধ্যা বেলা খাবার আগে, গোপিকারমণের ঘরে যে বোতলটি খোলা হয় ও শেষ করতে তিন দিন যায় সেটি টেবিলের মাঝখানে এসে বিরাজ করে এবং সেই রাত্রেই শেষ হয়।

মেয়েদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হোতে না হোতে গোপিকারমণের সংসারে আবার একটি নতুন সমস্যা এসে উপস্থিত হোলো। কিছুদিন থেকে কল্যাণ বিলেতে অসম্ভব রকমের টাকা খরচ করছিল। হঠাৎ এ রকম খরচ বৃদ্ধির কারণ জানতে চাইলে কখনো অসুখ কখনো বা অন্য কোন অজুহাত সে দেখাত। ছেলেকে বেশী টাকা পাঠাতে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি কল্যাণের সম্বন্ধে নানারকম কাণাঘুষা শুনতে পেলেন। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি স্থির করলেন যে, কল্যাণকে বিলেত থেকে আপাততঃ ফিরিয়ে এনে কিছুদিন নিজের কাছে রেখে আবার পাঠিয়ে দেবেন।

কল্যাণ বাপের চিঠি পাওয়া-মাত্র চলে এসেছে। গোপিকারমণও এই মাসখানেকের মধ্যে তার ব্যবহার ও হালচালে সন্দেহ করবার কিছুই পাচ্ছিলেন না। বরং অনেকদিন পরে তাকে দেখে তাঁর মনে হোলো, সে যেন আগের চেয়ে অনেক রোগা হোয়ে গিয়েছে। কলকাতা থেকে মধুপুরে যাবার সময় গোপিকারমণ কল্যাণকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে তখন যেতে চায় নি। তারপরে সেখানে গিয়ে ক্রমাগত তাকে আসবার জন্য চিঠি লেখায় সে কিছুদিন হোলো মধুপুরে এসেছে।

শীতের পরে যেমন হঠাৎ একদিন আকাশ বাতাস উতলা কোরে দিগ্বিজয়ী বসন্ত নিস্তব্ধ প্রকৃতির বুকে আনন্দের মর্ম্মধ্বনি ফুটিয়ে তোলে, তেমনি অনেক দিন নিস্তব্ধতার পরে একদিন বিকেল বেলায় মধুপুরের 'হিমানী কুঞ্জ' নারী ও শিশুকণ্ঠের কোলাহলে মুখর হোয়ে উঠ্‌ল।

গোপিকা বাবুর দুই ভগ্নীর দুই জমিদার বাড়ীতে বিয়ে হয়েছে। ছোট বোন রাধারাণী কলকাতাতেই থাকেন বলে ভাইয়ের সঙ্গে মাখামাখি তাঁরই বেশী। তিনি সম্প্রতি বিধবা হয়েছেন। বিধবা হবার পর প্রায়ই তিনি কিছুদিন কোরে ভাইয়ের সংসারে এসে থেকে যান। এবারে গোপিকারমণ মধুপুরে যাবার আগে অনেক কোরে তাঁকে বলে আসায় রাধারাণী নিজের তিন মেয়ে ও তাঁর পিতৃমাতৃহীনা একমাত্র ভাসুর ঝি নতিকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন।

পিস্‌তুত বোনদের আগমন উপলক্ষ্যে ইলা ও বেলা ছুটি পেয়েছে। তারা পাঁচজনে বাগানে ছুটোছুটি কোরে এই দু-দিনেই বসন্তের মরশুমী ফুল গাছের চারাগুলিকে ধরাশায়ী কোরে ফেলেছে। চীৎকার করতে করতে তিনটি উড়েমালীর গলা প্রায় বন্ধ হোয়ে এসেছে। বর্ষার নদীর মতন তাদের

অফুরন্ত আনন্দের প্রবাহ সমস্ত বাড়ীখানাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, কোন দিকেই তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

ইলা বেলার সমস্ত ভারই জয়ার ওপরে ন্যস্ত। কিন্তু ছোট পিসির আগমনে পড়ার দায় থেকে তারা ছুটি তো পেয়েইছে, এমন কি তারা বোনদের সঙ্গে খাওয়া শোওয়ার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত কোরে নিয়েছে। জয়ার কোনো কাজ নেই, সে সমস্ত দিন নিজের ঘরটিতে বসে পড়াশুনা করে, বিকেলে সকলে যখন বেড়াতে বেরিয়ে যায় তখন বাড়ীর বাগানেই অথবা বাড়ীর বাইরে ফাঁকা মাঠে কখনো বেড়িয়ে কখনো বসে সন্ধ্যা অবধি কাটিয়ে আবার নিজের ঘরটিতে ফিরে আসে।

সেদিন বিকেলে বাড়ীশুদ্ধ সবাই বেড়াতে বেরিয়ে লতি ও কল্যাণ একটু এগিয়ে পড়েছিল। তাদের দু জনের নিরিবিলি আলাপ করবার এই সুযোগ রাধারাণীই কোরে দিয়েছিলেন। লতি ও কল্যাণ উভয়েই উভয়কে ছেলেবেলা থেকেই জানে। তাদের এই জানাশোনাটা ভবিষ্যতে একটা পাকা রকমের সম্বন্ধে দাঁড় করাতে পারা যায় কি না এই প্রশ্ন নিয়ে দুই বাড়ীতেই যে বহু আলোচনা হয় সে কথা লতি ও কল্যাণ উভয়েই জানে। কল্যাণ বিলেতে যাবার পূর্ব্বে এ বিষয়ের একটা পাকাপাকি নিষ্পত্তি কোরে ফেলবার জন্য কল্যাণের মা খুবই ব্যস্ত হয়েছিলেন কিন্তু তখন দু'জনেরই বয়স অল্প ছিল বলে উভয় পক্ষেরই বাবা কিছু করতে দেন নি।

লতি বাল্যেই মাতৃহীনা। রাধারাণী তাকে মায়ের স্নেহেই মানুষ করেছেন। কিছুদিন আগে তার বাবার মৃত্যু হওয়ায় এবং বাড়ীতে অন্য কোনো পুরুষ অভিভাবক না থাকায় তার সমস্ত ভারই রাধারাণীর ওপরে পড়েছিল। লতির বয়সও হয়েছিল, আগের দিন হোলে এত বড় আইবুড় মেয়ে ঘরে রাখার কল্পনাও কেউ করতে পারত না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বিবাহের বয়সের গণ্ডীও লতি পেরিয়ে যাওয়ায় রাধারাণী তাকে নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হোয়ে পড়েছিলেন।

প্রায় চার বছর বিলেতে কাটিয়ে আসার পর লতির সঙ্গে কল্যাণের কলকাতার বাড়ীতে দু-একবার দেখা হয়েছিল। কল্যাণ যে বিলেতে খুব পয়সাকড়ি ওড়াচ্ছিল এবং লেখাপড়া শেষ হবার আগেই যে তার বাবা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন, এ সংবাদটা কল্যাণের পিসি অর্থাৎ লতির কাকীমা তার কাছে গোপন রাখবার চেষ্টা করলেও কথাটা তার কানে উঠেছিল। এবং সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু না জানার ফলে অনেক অস্পষ্ট কথা তার মনের মধ্যে উঁকি দিত।

সেদিন দুজনে নিরিবিলি হবার পর হঠাৎ লতি জিজ্ঞাসা করলে—কল্যাণ দা, বিলেতে অত টাকা ওড়াতে কি কোরে?

কল্যাণ লতির প্রশ্ন শুনে বল্লে—কি রকম?

লতি বল্লে—আমি শুনেছি, তুমি সেখানে খুব বেশী টাকা খরচ করতে বলে এখানে তোমার ওপর নানা রকম সন্দেহ চলে।

লতির কথা শুনে কল্যাণ হেসে ফেল্লে।

সে বল্লে—টাকা না ওড়ালে বুঝি সন্দেহের দায় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

লতি কোনো জবাব দিলে না দেখে কল্যাণ জিজ্ঞাসা করলে—বল না?

লতি বল্লে—আমি জানি না, যাও—

একটু পরেই সে আবার বল্লে—বিলেতে কিন্তু সচরাচর টাকা জিনিসটা ওড়ে—ঐ সন্দেহেরই দিকে—কেমন নয় কি না?

কল্যাণ লতিকে একটু রাগাবার লোভ সামলাতে পারলে না। সে বল্লে—তবে ও সব কথা জিজ্ঞাসা কোরে আমায় লজ্জায় ফেলছ কেন?

কথাগুলো শুনে লতির চোখ মুখ লাল হোয়ে উঠল। সে কোনো কথা না বলে কল্যাণের সঙ্গে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর কল্যাণ বল্লে—লতি, আমায় বিশ্বাস কর, আমার কোনো টাকা সন্দেহের পথে উড়ত না। সেখানে এমনিতেই এখানকার চেয়ে অনেক বেশী টাকা খরচ হয়। তার ওপরে অক্সফোর্ডে অনেক ছেলেরই ঘোড়া, মটরকার আছে। এ সব ছাড়া যে কত রকমের খরচ আছে—

লতি কল্যাণকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে—থাক্‌গে তোমার খরচের কথা আমি শুনতে চাই নে। তোমার টাকা তুমি খরচ করবে তাতে আমার কি!

লতির রাগ তখনো পড়ে নি দেখে কল্যাণ কথাবার্ত্তার ধারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টায় বল্লে—লতি, মিস্ ঘোষের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে ?

—না।

—আশ্চর্য্য ! তোমাদের বাড়ীতে একটি মেয়ে রয়েছে আর তার সঙ্গে আলাপ করবার ফুরসৎ পর্য্যন্ত তোমার হোলো না। বেশ তো !

লতির মুখখানা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হোয়ে উঠ্‌ল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে সে বল্লে—আমাদের বাড়ীতে কোনো মেয়ে থাক্‌লে এতদিনে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আলাপ হোতো। তোমার উপদেশের প্রত্যাশায় বসে থাকতুম না।

লতির মুখে এই জবাব পেয়ে কল্যাণ তার মুখের দিকে চাইলে। তার চোখে চোখ পড়্‌তেই লতি জোর কোরে মুখখানা ফিরিয়ে একখানা বড় পাথরের ওপরে গিয়ে বসে পড়্‌ল। কল্যাণ কিছুক্ষণ হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে থেকে আহ্বানের অপেক্ষা না কোরে তার পাশে বসে বল্লে—লতি, তোমার রাগটা এখনো দেখ্‌ছি সেই রকমই আছে। আমি বল্‌ছিলুম যে, আমাদের বাড়ীটা মিস্ ঘোষের চেয়ে কি তোমার আপনার নয় ?

লতি বল্লে—তোমার মিস্ ঘোষের সঙ্গে সেধে গিয়ে আলাপ না করায় আমার অপরাধ হয়েছে, মাপ কর।

কল্যাণ বল্লে—অপরাধের কোনো কথা হচ্ছে না। এ সামান্য ভদ্রতার কথা—

কল্যাণের বক্তব্যটা শেষ করতে না দিয়ে লতি বলে উঠ্‌ল—আমি অতি অভদ্র—তা কি জানো না ?

কথাটা শেষ কোরেই লতি সেখান থেকে উঠে চলে গেল। কল্যাণ কয়েক মিনিট সেখানে চুপ কোরে বসে থেকে বাড়ীর অন্য সবাই যেখানে বসেছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হোলো। তাকে একলা দেখেই রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলেন—কল্যাণ, লতি তোর সঙ্গে ছিল না ?

কল্যাণ বল্লে—হ্যাঁ কিছুক্ষণ ছিল, তার পরে ঐ দিকে কি দেখতে চলে গেল।

রাধারাণী, কল্যাণ ও লতি উভয়কেই চিন্‌তেন। কল্যাণের উত্তর দেবার ধরণ দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, তারা ঝগড়া করেছে। মুখখানা বিরক্তিতে পূর্ণ কোরে তিনি ইলাকে বল্লেন—ইলা, দেখ্ তো, তোর লতি-দি কোন্ দিকে গেল। তাকে ডেকে নিয়ে আয়।

ইলারা এতক্ষণ ছোটপিসির শাসনে বাধ্য হোয়ে লতির সঙ্গ ত্যাগ কোরে তাঁর কাছে বসেছিল। হঠাৎ এই আদেশ পেয়ে সে আর বাক্যব্যয় না কোরে উঠেই একদিকে দৌড় দিলে। ইলার কিছু পরে বেলা, তার পরে একে একে টুনী, চুনী ও মণি সবাই সেইদিকে ছুটল।

মেয়েদের আস্‌তে দেরী হচ্ছে দেখে রাধারাণী সেখান থেকে উঠে গিয়ে দেখলেন যে, তারা লতিকে ঘিরে একটা পাথরের ওপরে বসে দিব্যি গল্প কর্‌চে ! তিনি দূর থেকে হাঁক দিলেন—লতি, উঠে এস। সন্ধ্যে হোয়ে গেল, বাড়ী ফির্‌তে হবে না !

কথাগুলো লতির কানে যেতেই সে বুঝতে পারলে যে, তার আসল অর্থের চাইতে ঝাঁজটুকুর মূল্যই বেশী। সে হেসে বলে উঠল—এই যে চল না, তোমরাই তো দেরী কর্‌চ।

সেদিন রাত্রে রাধারাণীর আয়োজন অনুসারে কাল্যাণের পাশেই লতির বসবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। লতি চেয়ারখানা টেনে তার জায়গায় বস্‌তে বস্‌তে কল্যাণকে বল্লে—তোমার কাছে বস্‌তে ভয় করে, তুমি খালি আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার মতলবে আছ।

বিকেল বেলা লতির কাছ থেকে কল্যাণ যে খোঁচা খেয়েছিল তার জ্বালা তখনো সে সম্পূর্ণরূপে ভুল্‌তে পারে নি। লতির অনুযোগ তার কানে যেতেই সে উত্তর দিলে—ঝগড়ার সুযোগ না দিলে তো আর ঝগড়া হয় না।

লতি ছাড়বার পাত্রী নয়। সে তখুনি বলে উঠ্‌ল—যে কেবলি সুযোগ খুঁজে বেড়ায় তাকে আর কতক্ষণ আটকে রাখা যায় বল !

রাধারাণী এঁদের সঙ্গে টেবিলে বসতেন না। স্বামী জীবিত থাকতে তিনি টেবিলেও খেতেন এবং দাদার বাড়ীর বাবুর্চ্চি যে তাঁদের বাড়ীর বাবুর্চ্চির চেয়ে ঢের ভাল রাঁধে সে কথা প্রতি বারেই প্রকাশ করতেন। কিন্তু বিধবা হওয়ার পরই তিনি কি কোরে বুঝতে পেরেছেন যে, মুসল-

মানেরা অত্যন্ত নোংরা। তাদের হাতের ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত আজকাল তিনি স্পর্শ করেন না। খেতে না বসলেও তিনি দু-বেলাই কাছে থেকে সবার খাওয়ার তদারক করতেন। সে দিন বিকেলে বেড়াবার সময় নতি ও কল্যাণের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি একটা কিছু হয়েছে এই রকম সন্দেহ কোরেই তিনি তাদের দুজনকে পাশাপাশি বসিয়ে সেদিকে চক্ষুকর্ণ সজাগ কোরে দাঁড়িয়েছিলেন। নতির শেষ কথাগুলো শুনে তিনি সেখান থেকেই বলে উঠলেন—নতি বুঝি কল্যাণের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করচিস্?

গোপিকাবাবু মুখ তুলে নতি ও কল্যাণের দিকে চাইলেন। অপ্রস্তুত নতির মুখ লাল হোয়ে উঠ্‌ল। সে কোনো কথা না বলে ঘাড় নীচু কোরে রইল। তার অবস্থা দেখে কল্যাণ বল্লে—না ঝগড়া করে নি।

গোপিকাবাবু খেতে খেতে তাঁর বোনকে বল্লেন—রাণী, ক'দিন থেকে জয়াকে টেবিলে দেখ্‌চি না যে? তাকে টেবিলে ডেকো, সে নিশ্চয় এক্‌লা পড়েচে!

রাধরাণী চারি দিকে চেয়ে বল্লেন—সত্যই তো! এখানে এসে অবধি তার সঙ্গে সেই একবার বৈ দেখাই হয় নি।

একটু চুপ কোরে থেকে রাধারাণী আবার বল্লেন—তাকে ডাকতেই বা হবে কেন? তার নিজেরই তো আসা উচিত।

রাধারাণীর কথাগুলি শেষ হোতে না হোতে কল্যাণ বলে উঠ্‌ল—না ছোটপিসি, তা উচিত নয়। বাড়ীতে কেউ এলে বাড়ীর শিক্ষয়িত্রীকে আড়ালেই থাক্‌তে হয়।

রাধারাণী বল্লেন—তোমাদের বাপু অত সাহেবীয়ানা আমার সহ্য হয় না। দেখ দিকিন, বাড়ীর একজন আশ্রিতা, সে কোথায় কোন্ কোণে পড়ে রইল আর আমরা এখানে সবাই মিলে আমোদ করচি।

ব্যাপারটা রাধারাণীকে অত্যন্ত পীড়িত কোরে তুল্লে। তিনি আবার সুরু করলেন,—আচ্ছা, নতি তো তাকে ডেকে নিয়ে এসে বসাতে পারিস্! সে তো তোরই বয়সী, তোরই উচিত তার সঙ্গে মেলা-মেশা করা।

রাধারাণীর মুখ থেকে এ কথা বেরুনো মাত্র নতি তার দিকে না চেয়ে মুখ তুলে কল্যাণের দিকে একবার চাইলে। কল্যাণ আগে থাকতেই তার দিকে চেয়েছিল, তার চোখে পড়তেই সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রাধারাণীকে বল্লে—কেমন কোরে জান্‌ব ছোটকাকী, এ বাড়ীর কি নিয়ম কানুন! শেষকালে কি নিয়মভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হব!

নতির কথা শুনে গোপিকারমণ হেসে বল্লেন—ঠিক বলেচ নতি। তার পরে রাধারাণীকে বল্লেন—নতি তো নিজেই এখন এখানে অতিথি। ওর নিজের বাড়ী হলে ও নিশ্চয় জয়াকে ঘরের মধ্যে এক্‌লা থাক্‌তে দিত না। কি বল নতি?

নতি গোপিকাবাবুর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু একটু হাস্‌লে। কল্যাণ আর একবার তার মুখের দিকে তাকালে কিন্তু সে ইচ্ছা কোরেই মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে রইল।

খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর গোপিকাবাবু বল্লে—নতি, এবার গান গাও। অনেক দিন তোমার গান শুনি নি।

নতি পিয়ানোর দিকে অগ্রসর হতেই কল্যাণ ধীরে ধীরে সবার অলক্ষ্যে বাগানে বেরিয়ে গেল।

গোপিকাবাবুদের মধুপুরের বাড়ীর চারিদিকে প্রকাণ্ড জায়গা। এই জায়গায় বাগান করা হয়েছে। বাড়ীটা উঁচু একতলা, তারই চারিদিকে ঘর, প্রত্যেক ঘর থেকেই বাগানে বেরিয়ে আসা যায়। রান্না-বাড়ী বাগানের কোণে। আসল বাড়ীটা ছাড়া বাগানের কোণে ছোট একখানা বাড়ী আছে। এই বাড়ীটিতে অতিথি অভ্যাগত কেউ এলে থাকেন। ছোটপিসিরা আস্‌চেন শুনে কল্যাণ বাড়ী ছেড়ে এই ছোটবাড়ীটায় আস্তানা করেচে।

বাগানে এসে কল্যাণ এমন একটি জায়গা দেখে বস্‌ল যেখান থেকে জয়ার ঘরখানি দেখা যায়, এই স্বল্পভাষিনী ও বুদ্ধিমতী মেয়েটি প্রথম দেখার দিন থেকেই তাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছিল।

জয়াকে খুব সুন্দরী বলা যায় না। তার রং ফরসা বটে, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখতে গেলে চোখ মুখ নাক খুব সুন্দর নয়। এ সব সত্ত্বেও তার তনুলতা এমন একটি সুষমায় মণ্ডিত যা পুরুষকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। কল্যাণ

প্রথম দেখার দিন থেকেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু জয়া স্বাভাবিক সংযমের দ্বারা নিজের চতুর্দ্দিকে এমন একটি বর্ম্ম তৈরি কোরে রেখেছিল যে, সে কিছুতেই তা ভেদ করতে পারছিল না।

কল্যাণ সেখানে বসে-বসে দেখতে পেলে জয়ার ঘরে আলো জ্বল্‌ছে। তার মনে হোতে লাগ্‌ল ঘরের মধ্যে জয়া এখন কি করছে! ঐ শান্ত সংযত মেয়েটি ঘরের মধ্যে সারাদিন একলা কি করে! কার কথা সে ভাবে, কাকে চিঠি লেখে! বাড়ীতে তার কে আছে? কল্যাণ যে শিক্ষা, পরিবার ও আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছে সেখানে অপরের দৈনন্দিন ও জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটির খোঁজ করা অসভ্যতা ও অন্যায় কৌতূহলের নামান্তর। কারুর সম্বন্ধে এ রকম চিন্তাও আজ পর্য্যন্ত তার মনকে এমন ভাবে আকুল করে নি। এ চিন্তা যে তার পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক এ কথা তার একবারও মনে হোলো না।

জয়ার চিন্তায় কল্যাণের মন যত দ্রুতবেগে ছুটে চল্‌ল তার দৃষ্টিও সেই অনুপাতে সঙ্কুচিত হোয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। জয়ার ঘরে যে কখন আলো নিভে গেল, কখন যে সে বাগানের দিকের দরজা খুলে জ্যোৎস্নালোকে এসে দাঁড়াল তা কল্যাণ দেখতেই পেলে না।

হঠাৎ এক ঝলক্ পূবে বাতাস প্রকৃতির শান্ত বুকে একটি দীর্ঘশ্বাস তুলতেই কল্যাণের চমক ভেঙে গেল। সে মুখ তুলে দেখলে দূরে চাঁদের আলোয় জয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার শাসনমুক্ত কেশরাশি পিঠ থেকে দুই কাঁধের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অতি সংযত জয়ার সেই অসম্বৃত অবস্থা তার মনের মধ্যে একটি গভীর রেখাপাত করলে। তাকে দেখতে দেখতে কল্যাণের মনে হোতে লাগ্‌ল যে, রহস্যময়ী জ্যোৎস্নার সঙ্গে এই রহস্যময়ী জয়ার যেন অতি নিকট সম্পর্ক। তার দীর্ঘ ঋজু দেহ ও তার বর্ণের সঙ্গে চন্দ্রালোকের এই যে মিলন এর যেন তুলনা নেই। তার মনে হোতে লাগল জয়া যেন চন্দ্রেরই মানসী। তার কল্পনা ও তারই আলোক দিয়ে সে জয়াকে গড়ে ধরায় নামিয়ে দিয়ে অতন্দ্র হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। বিলেতে থাকতে চন্দ্রালোকে স্নাত অনেক সুন্দরী রমণীর মূর্ত্তি দেখার সৌভাগ্য তার বহুবার হয়েছে; কিন্তু তার সঙ্গে অনেকের এই ছবির তুলনা কোরে সে দেখলে যে, সে মদিরা পান করলে রূপতৃষ্ণা বেড়েই চলে, কিন্তু এই শান্তরূপে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়।

জয়াকে দেখতে দেখতে কল্যাণ মনে মনে পণ করলে, অন্তরের মণিকোঠায় কি ধন সঞ্চিত আছে তার সন্ধান তাকে নিতেই হবে, কেন সে এমন কোরে তার কাছে থেকে পালিয়ে বেড়ায়!

মনে মনে দৃঢ় সংকল্প কোরে কল্যাণ বেঞ্চি থেকে উঠে জয়ার দিকে অগ্রসর হোলো, কিন্তু জয়া তাকে দূরে দেখতে পেয়েই ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা বন্ধ কোরে দিলে। সে ঘরের মধ্যে চলে যেতেই কল্যাণের চোখে জ্যোৎস্না যেন নিভে গেল। সে একবার মুখ তুলে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে। তার মনে হোতে লাগ্‌ল, আকাশের চাঁদটা যেন এক চোখ টিপে তার সঙ্গে রহস্য করছে।

—ক্রমশ

দাপট

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

(১৮)

সৌভাগ্যক্রমে একদিন সকাল বেলা কল্যাণ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কয়েক দিন না কাটিতেই আত্মীয় স্বজন বলিলেন, এইবার তাহলে বাপের শ্রাদ্ধটা সেরে ফেল।

কল্যাণ একটু মুখফোঁড়্। সে বিনীতভাবে বলিল, আমার বাবার শ্রাদ্ধটা এতকাল ত আপনারাই করে এসেছেন, আরও কি দরকার?—এবং সেটা আমাকে দিয়ে না করালেই নয়?

ছুই একজন প্রবীণ ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা বলিলেন, এ সময়ে তোমার এ ভাবে কথা বলা সাজে না কল্যাণ।

কল্যাণ তেমনি নম্রভাবে বলিল, শুধু কথা কয়টি প্রকাশ করে বলার দরুণ যদি কোনও অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে আপনারা আমাকে অপরাধী করতে পারেন। কিন্তু মনের ভাব আমার ওই।—আমার বাবা কতটুকু অন্যায় করেছিলেন এবং তার জন্য আপনারা তাঁর কতখানি শাস্তিবিধান করেছিলেন তা হয় ত আপনাদের মনে নাই। যদি স্বীকার করেই নিই, আমার বাবা তাঁর জীবিতাবস্থায় একটা ভয়ানক অপরাধ করেছিলেন, কিন্তু তারপর তার জন্য তাঁর মনে কোনও অনুশোচনা এসেছিল কি না সে কথা তাঁকে কেউ ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল কি? করে নি। এমন কি আমার মা-ও না।

একজন বৃদ্ধ বেশ একটু ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, তাতে কি লাভ হোত বাপু?

কল্যাণ ধীর স্থির স্বরে উত্তর করিল, তাতে আপনাদের লাভ না হোক্ আমার মা'র, আমার এবং সমস্ত সমাজের অনেকখানি লাভ হোত। আর তাও বড় একটুখানি নয়।

অন্তঃপুরের দরজার কাছে শোভনা প্রভৃতি সকলেই দাঁড়াইয়াছিল। বিমলা তাহার ছেলেকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল, দাদাবাবুকে মা ভিতরে ডাক্ছেন।

কল্যাণ এই ভাবে কথা বলিতে গিয়া কিছুক্ষণ হইতে মনে মনে একটু বিরক্তই হইয়াছিল। কেহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে নিজে উত্তর করিল, মাকে গিয়ে বল, মা'র চাইতে যাদের দরদ বেশী তাঁরা এখন কথা বল্ছেন, তাঁদের ফেলে এখন আমি যেতে পারব না।

ছেলেটি চলিয়া গেল। প্রবীণ বিশুকাকা এই পরিবারের সহিত বহুকাল হইতে আত্মীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট। রক্তের সম্বন্ধ কিছু নাই। তিনি কল্যাণকে বলিলেন, লাভটা কি হোত সেটা তুমি কখনও ভেবে দেখেছ কি?

কল্যাণ বলিল, ব্যথা আমার, জ্বালা আমার; আমি ভাব্ব না সে কথা, ভাববেন কি আপনারা? একবারও ভেবেছিলেন কি আমার মায়ের মনের কি অবস্থা? একবারও আপনাদের ঐ দয়াকাতর মনে এই হতভাগ্যের অবস্থার কথা কিছু মনে হয়েছিল কি? গোত্রহীন, গৃহহীন, আপন পরিবারের সমস্ত সম্বন্ধ, সমস্ত শান্তি থেকে বঞ্চিত একটি গৃহস্থের ছেলের কি অবস্থা হোল তার কথা এই দীর্ঘকালের মধ্যে একবারও আপনাদের মনে হয়েছিল কি?

বিশুকাকা বলিলেন, সে তোমার দাদামশাইয়ের দোষ। তিনিই তোমার মাকে নিয়ে এসেছিলেন!

কল্যাণ বলিল, সহস্রবার মানি সে কথা। আমার দাদামহাশয় আমার মায়ের অপমান সহ্য করতে না পেরে তাঁকে নিজগৃহে এনে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর? তারপর কি ফিরিয়ে দেবার মত আর কোনও সুযোগই আসে নি? একটা ভুল, একটা অভিমানের বশে দুইটি মানুষের জীবন আপনারা দগ্ধে দিয়েছেন, আর তার সঙ্গে—তাঁদের একটি মাত্র সন্তান, তার কপালে একটা কলঙ্কের রাজটীকা পরিয়ে তাকে পথে ছেড়ে দিয়েছেন! কোন্ অধিকারে আবার আপনারা আমাদের পরিবারের হিত বা অহিতের সম্বন্ধে কথা বল্‌তে আসেন? আপনারাই কি পরামর্শ দিয়ে দাদামশাইকে ক্ষিপ্ত করে তোলেন নি? আপনারাই কি আবার ঠাকুরদাদার কানের কাছে মন্ত্র দিয়ে এই পারিবারিক কলহকে পাকিয়ে তোলেন নি? আমার ত স্পষ্ট মনে আছে। কিছুদিন পরে বাবা যখন অনুতপ্ত হয়ে সাহস করে বল্‌লেন, তাঁর পিতার সহস্র আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁর সন্তান এবং স্ত্রীকে গৃহে ফিরিয়ে আনবেন, তখন?—তখন আপনারা কি বলেছিলেন? কিছু কি তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, না দাদামশাইর কাছে এসে নানা কথা বলে আরও তাঁর মনকে বিষাক্ত করে তুলেছিলেন?

বিত্তকাকা বলিলেন, তুমি বড় উত্যক্ত হয়েছ কল্যাণ! একটু শান্ত হয়ে শোন আমাদের কথা।

কল্যাণ বাধা দিয়া বলিল, আমি শান্ত হয়ে শুন্‌ব? আপনারা কি একবিন্দুও অনুমান করতে পারেন, আমার বাবা, আমার মা এবং আমি নিজে কতবড় অসহ্য যন্ত্রণা এতদিন শান্ত হয়েই সহ্য করেছি! আপনারা তা পারবেন না। আপনাদের গৃহ আছে, পরিবার আছে, তার স্নিগ্ধ শীতল আশ্রয়ে যে অপরিমেয় আশা ও শান্তি তা আপনারা চিরকাল ভোগ করে আস্‌ছেন। গৃহহীন, আশ্রয়হীন, পারিবারিক বন্ধনচ্যুত মানুষের মনে যে কি তীব্র জ্বালা তা আপনারা অনুমানও করতে পারেন না।

বিত্তকাকাই আবার অগ্রণী হইয়া বলিলেন, তুমিই আজ ভেবে দেখ কল্যাণ, ওরকম করে জোড়াতালি দিয়া যদিই-বা তোমাদের পরিবার আবার প্রতিষ্ঠিত হোত, তাহলেও কেবল তিক্ততাই ভোগ করতে।

কল্যাণ দৃঢ়স্বরে বলিল, নিজ পরিবারে, দেবতা প্রতিষ্ঠিত গৃহস্থের গৃহে কারও আচরণে বা অন্য কারণে কেবল তিক্ততাই যদি পাই, সমস্ত জীবনের জন্য কি শুধু সেইটাই সত্য হল? আর সমস্ত অমিল, অনিয়মের মধ্যে যদি কোথাও কিছু লাভ হয়ে থাকে জীবনে তার কি কোনও দাম দেবেন না? মানুষের পক্ষে কি সেটা একটুখানি?

আর একজন এবার একটু বিদ্রূপ করিয়াই বলিল, তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, তোমার আবার গৃহ বা গৃহীর কথা কি?

কল্যাণ আরক্ত নয়নে একবার সেই ব্যক্তির দিকে চাহিয়া বলিল, আমি সন্ন্যাসী আপনাদের কে বল্‌ল? যার পরিবার নেই, গৃহ নেই; মা বাবার স্নেহ মমতা হতে যে জন্মাবধি বঞ্চিত, তার আমার মত সন্ন্যাস গ্রহণ করা ভিন্ন আর কি উপায় ছিল?

লোকটি হাসিয়া বলিলেন, তাহলে তুমি সন্ন্যাসী নও!

কল্যাণ দেখিল, বিরক্ত হইয়া কোনই লাভ নাই। সে তাই বলিল, আপনারা যাকে কলঙ্কের জন্মচিহ্ন এঁকে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন সে আর কেমন করে গৃহীর আশ্রয়ে থেকে তাদেরও বিব্রত করে?

একজন আবার ওরই মধ্য থেকে বলিয়া উঠিল, তুমি নিজেই ত তোমার নিজের আশ্রয় ত্যাগ করে এসেছিলে।

কল্যাণ স্বীকার করিল, এসেছিলাম, আর তাও করেছিলাম আপনাদের পাঁচজনের কথায় বিশ্বাস করে। আমি আমারবাবাকে সে জন্য যথেষ্ট অপমান করেছি। কিন্তু যখন সে কথা বুঝ্‌তে পারলাম, তখন আর কোনও পথ ছিল না। আমার বাপ আমারই মত পথে পথে ঘুরে ক্লান্ত অবসন্ন। আমারই মত অসহায়, অশান্ত। অনাহারে, অত্যাচারে, নিরাশায় তিনি তখন উন্মাদের মত। কতবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কতবার ইচ্ছা হয়েছে—বাবা বলে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ি, কিন্তু তা পারি নি। তখনও হৃদয়াবেগ প্রবল। এক এক সময় মানুষের মনের আবেগ দুর্মূল্য বস্তু স্বীকার করি, কিন্তু তা' যখন মানুষের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন তার মত বড় শত্রু মানুষের আর হয় না। আমি লোক দিয়ে তাঁর সেবা করিয়েছি, ক্লান্ত হলে তাঁর কাছে কাছে থেকে তাঁকে একটু সুখ সুবিধা

দেবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে থেকেছি কিন্তু তাঁর শরীর ও মন তখন সমস্ত চৈতন্তের অতীত। তাঁর সেদিনকার চোখের দৃষ্টিতে শুধু একটা ব্যাকুল অনুসন্ধান। আমি সন্তান—তাঁরই সন্তান, তাই সে দৃষ্টির রশ্মি আমার বুকে এসে লাগ্‌ত। আপনারা ভাব্‌তে পারেন না, নিজেকে তখন গোপন করে রাখার কি বেদনা। মনে হয়েছে—মা আমার, আমার সব সুখে বঞ্চিতা মা আমার কি-বেদনায়, কি অপমানের শলাকায় বিক্ষত হয়ে আজ জীবন্মৃতা।

ভিতরে হঠাৎ একটা অস্পষ্ট কান্নার ধ্বনি শোনা গেল।

কান্নার শব্দ শুনিয়াই কল্যাণ একেবারে উঠিয়া পড়িল। সংক্ষেপে বলিল, বিশুকাকা, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন গিয়ে, আমি আমার বিবেচনামত বাবার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করব।

সকলে বিদায় হইবার পূর্ব্বেই কল্যাণ ছুটিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। একেবারে মায়ের পায়ের তলায় হু হু করিয়া কাঁদিয়া পড়িল।

বলিতে লাগিল, মা, পেয়েছিলাম মা তাঁকে, এতকাল তাঁর পেছনে পেছনে ছায়ার মত ঘুরেছি। কিন্তু একবার একটা কাজে হঠাৎ পড়ে গিয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।—বড় আশা ছিল, একবার একদিন বাবাকে তোমার সাম্‌নে এনে দাঁড় করাতে পারব।

শোভনা অনেক কষ্টে চোখের জল মুছিয়া কল্যাণকে বুকের মধ্যে তুলিয়া লইল। বলিল, তিনি এসেছিলেন, বোধ হয় আমাকে চিন্‌তেও পেরেছিলেন। তখনও যেন কাকে খুঁজ্‌ছিলেন,—বোধ হয় তোমাকেই।

কল্যাণ বলিল, মা শান্তি হয়েছে তাঁর। দুটি কক্ষভ্রষ্ট তারার মত আমরা দুজনে মহাশূন্তের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু এমনি ভবিতব্য, কাছাকাছি আর একটি দিনও হতে পারলাম না!

বিমলা বলিল, অতকথা তুমি তাঁদের সঙ্গে না বল্‌লেও পার্‌তে কল্যাণ।

কল্যাণ বলিল, বল্‌লাম ইচ্ছে করেই মামীমা। একদিন ছিল, যখন সমাজ বা বংশের নাম করে' ব্যক্তিকে বলি দেওয়া হোত, কিন্তু ফল কি তার ভাল হয়েছে? মানুষকে কেবল অস্বীকারই করা হয়েছে। শাস্তির যে একটা ভয় সেটা বাইরে থেকে আসে বলেই যে বড় তা নয়। মানুষের ভিতরেও কি ভয় কম থাকে নাকি? সে ভয় ভয়ঙ্কর— মানুষকে ভয় করে মানুষ মানুষ না হয়েও পারে, কিন্তু ভিতরের ভয়কে তার মেনে চল্‌তেই হয়। মানুষ যদি কেউ কখনও হয়, তাহলে ভিতরের ভয় তাকে নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ করে না বলে'ই।—মানুষ মানুষকে শাস্তি দিতে আসে কোন্ আশায়?

একটি তরুণী আসিয়া ডাকিল, বড়বৌদি, বিহারী-কাকা আমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন, নতুনবৌদি তোমাকে বল্‌তে বল্‌লেন।

কল্যাণ বিমলার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চিন্‌তে ত পারলাম না!

বিমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, ও যে নির্ম্মলা, তোমার মাসী—।

কল্যাণ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, কি আশ্চর্য্য! এত বড় হয়ে গেছ ছোটমাসী! আমি বোধ হয় তোমাকে একেবারেই দেখি নি? তাই না?

বিমলা বলিল, বোধ হয় দেখ নি। ঐ সব গোলমালের পর তোমার বড়মামা ওকে বিদেশে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর ও এই এল। দিন চারেক হয় এসেছে।

এমন সময় ধীরেন খুব প্রফুল্ল মুখে আসিয়া বিমলাকে ঢিপ্‌ করিয়া প্রণাম করিল।

বিমলা সস্নেহে তাকাইয়া বলিল, ব্যাপার কি? আজ হঠাৎ এত ভক্তির আতিশয্য?

ধীরেন গদগদ কণ্ঠে বলিল, সে আপনারই কৃপায়।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, কৃপা ত আমি চিরকালই করেছি। তুমি হতভাগা ডাকাত দস্যু বলে তোমাকে কৃপাটা একটু বেশীই করতাম। কিন্তু এ আজ তোমার হোল কি? তারপর হঠাৎ একটু চুপ করিয়া কি ভাবিয়া বলিল, ওঃ বুঝেছি! তাই নাকি?

ধীরেন হাসিয়া বলিল, হাঁ তাই।

একেবারে পাকা?

এখনও ত পাকা বলেই জানি। তবে কাঁচ্‌তে কতক্ষণ!

কেন, তোমার সে ভয়ও আছে না কি?

খুব ছিল, এখনও আছে।

বিমলা বলিল, তা হলে' ত ভাল কথা নয়। শেষকালে

বিপদে পড়বে। তার চাইতে আগে বোঝা-পড়া করে নিলে না কেন একটু ?

ধীরেন বলিল, সে সুযোগ হয় নি। তিনি নিজেই তাঁর বাপ-মাকে বলেছেন এবং বলেছেন যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।

বিমলা হাসিয়া বলিল, ওহো, তাই বুঝি আজ আমাদের সব নেমন্তন্ন। কথাগুলি বলিয়াই বিমলা কেমন যেন একটু বিষন্ন হইয়া গেল।

ধীরেন বলিল, আমি একবার উপরে সকলকে প্রণাম ক'রে আসি। বলিয়া সে চলিয়া গেল

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ তুমি এমন হয়ে গেলে কেন মামী-মা ?

বিমলা একটু চিন্তিতভাবে বলিল, এ ভাল হোল না—ধীরেনের সঙ্গে পুষ্পর বিয়ে।

কল্যাণ বলিল, সে ত সুখের কথা। ভাল হোল না কেন বল্‌ছিলে ?

বিমলা মনের ভাবটা চাপা দিয়া বলিল, না, ধীরেন ত তেমন কিছু রোজগার করে না। পরিবার পালতে হবে ত, তাই বল্‌ছিলাম।

কল্যাণ বেশ বুঝিয়া গেল। বলিল, ওঃ তাই ?

বিমলা কি যেন ভাবিতেছিল, একটু আনমনা ; কল্যাণ কি জিজ্ঞাসা করিতেছে তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য না করিয়াই নিজের মনে উত্তর দিয়া যাইতেছিল। বলিল, শুধু তাই নয়—ওদের দুজনের একেবারে বিভিন্ন প্রকৃতি। দুজন দুজনাকে ভালবাস্‌তে না পারলেই যে মনের মিল হয় না এমন কথা যারা বলে তারা ভুল বলে। ভাল না বাসলেও ভাল থাকা যায়। তোমার মামাবাবু কোনও দিন আমাকে ভালবাস্‌তেন্ না, আমি তা' জান্‌তাম। তবু তাঁর কাছ থেকে যে মমতা ও স্নেহের পরিপূর্ণতা লাভ করেছি তাতে আর আমার চাইবার মত কিছু থাকে নি কোনও দিন। কি না করেছেন তিনি আমাকে নিয়ে! আমার একটুখানি ত্রুটি হলে তিনি বিষম রাগ করেছেন, আমি একটা ভাল কাজ করলেও তিনি কখনও উচ্ছ্বসিত হয়ে সে কাজের প্রশংসা করেন নি, কিন্তু তবু আমি বুঝতে পারতাম তিনি ভালবাসার চাইতেও আমাকে ভালবাসেন বেশী। ভালবাস্‌লে তার একটা দাবী থাকে ;—ভালবাসার জাল বুনে মানুষ কিছু একটু আশা করে বসে থাকে। কিন্তু আমার মনে তা কিছুই ছিল না। কোনও দাবী ছিল না আমার, আমি আশাও করি নি কিছু—কিন্তু তবু আমি তাঁর এতখানি লক্ষ্যের জিনিষ ছিলাম! এ'তে কি আমার কম পড়্‌ত কিছুই! স্বামীর চিরজাগ্রত দৃষ্টি আমার সকল কাজে ও অবস্থায়—এ কি ভালবাসা পাওয়ার চাইতে কম কিছু হোল ? কল্যাণ, তিনি আমাকে ভালবাসলে এর বেশী কি দিতেন আমাকে ?

কল্যাণ বলিল, কিন্তু মামীমা, এই অবস্থায় ত কেবল একজনকে অন্যের একটু দৃষ্টির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতে হয়! সে কি ভাল ?

বিমলা তখন সম্মুখের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়াছিল। সে যেন ধ্যানে আচ্ছন্ন—তেমনি ভাবে ধীর অথচ গম্ভীর স্বরে বলিয়া চলিল, তোমরা পুরুষ, তা বুঝ্‌তে পারবে না। আর বুঝ্‌তে পার না বলেই ভাব মেয়েদের এ কি অধীনতা, কি এ দুঃখের জীবন! কিন্তু আমি বল্‌ছি কল্যাণ, এক জনের মুখের দিকে সূর্য্যমুখী হয়ে চেয়ে থাকার মধ্যে কি একটা অপরিসীম আনন্দ! কি যে সুন্দর একটা আবেগ ও আগ্রহ নিরন্তর মানুষের অন্তরে চির-চৈতন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে! সে সুখের কথা সূর্য্যমুখী জানে ; একজনের মুখের দিকে ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকার যে আনন্দ সে শান্ত শীতল জলের উপর থেকেও পদ্ম বোঝে। এ কি কম সুখ! আমি ভাব্‌তে পারি না কল্যাণ, মানুষ আর কি চায় ?—একজনের কাছে আমি সব দিয়ে ফেলেছি, সে আমার সকল কিছুর ভাণ্ডারী, ক'জনের ভাগ্যে এমন করে' নিজেকে হারিয়ে ফেলা সম্ভব হয় ?

কল্যাণ বলিল, কিন্তু তা যে না পারে ?

বিমলা বলিল, সেই কথাই ত হচ্ছে। ওদের কেউ তা' পারবে না। কিন্তু যে পারত, বিধাতা তাকে দিয়েই আজ ওদের ঘর বাঁধাচ্ছেন। আর সে ঘরে থাকবে এরা।

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিল, সে কে মামীমা ?

এমন সময় দীপক আসিয়া বলিল, বড়বৌদি, আমি ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে এলাম। আর ভাল লাগে না ও সব। ওতে কি আছে? এ ত সব মানুষই পারে। বলিয়া দীপক ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে চৌকির উপর বসিয়া পড়িল।

বিমলা একটু ভাবনায় পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি বিহারীকাকাদের বাড়ী থেকে আসছ?

দীপক মাথা না তুলিয়াই ক্লান্ত স্বরে বলিল, হ্যাঁ, এখন সেখান থেকেই আসছি।

বিমলা উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করিল, তারপর!

দীপক আলস্যজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিল, তারপর আর কি? বিহারীকাকা, কাকীমা, পুষ্প—এদের সকলকে আমি খোলাখুলি সব কথাই বলে এলাম।

বিমলার মনে যেন একটা ভয় হইল। জিজ্ঞাসা করিল, তাঁরা কি বললেন?

দীপক বলিল, কি আর বলবেন! বললেন, তোমার যা' ইচ্ছা তাই কর।

বিমলা বলিল, পুষ্পও তাই বলল?

দীপক একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, না, সে একটু বেশী বলেছে। আমাকে ঠাট্টা করে' বলল, এবার আবার কোন্ পাড়ায় লাগ্‌বেন?—কিন্তু বড়বৌদি, আমি বুঝ্‌তে পারি না মানুষের এ কি কথা? ✓আমি একটা কিছু আরম্ভ করলাম—বেশ চালিয়ে যাচ্ছি—তারপর তার সফলতার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমার মনে হয় এর চাইতে আরও কিছু কঠিন, আরও কিছু সুন্দর ও বড় কিছু আছে, তাহলে দোষ কি? আমি সৃষ্টি করব—মানুষ তাকে লালন করবে। একের পর এক আমি নব নব উল্লাসে দিগদিগন্তে ছেয়ে যাব—আমার সীমানা নাই, বন্ধন নাই। কিছু পাবারও লেশ মাত্র আশা থাক্‌বেন না; কিছু দেবারও কণা মাত্র অহঙ্কার থাকবে না ✓

বিমলা চিন্তিত ভাবে বলিল, আমি জান্‌তাম, তুমি হয় ত পুষ্পকে এম্‌নি করেই একদিন আঘাত করে' আস্‌বে। আমার সে ভয় ছিল।

দীপক হাসিয়া বলিল, তাকে আঘাত করতে পারি এমন অস্ত্র আমার হাতে নেই। সে আঘাতকে সর্ব্ব অঙ্গ দিয়ে ভোগ করে।—তবে এটা ঠিক্—আমি তার কথা ভেবে, তোমাদের সবাইকার কথা ভেবে এ কাজ করেছি। আমি ভেবে দেখ্‌লাম, অন্তত পুষ্প ও ধীরুদাকে এখন আর আমাদের এই পাগলামীর মধ্যে আটুকে রাখা ঠিক্ হবে না। তাই মৌচাক ভেঙে দিতে চাই।

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিল, মৌমাছিরা?

দীপক হাসিয়া বলিল, যার যেখানে খুসী আবার গিয়ে চাক্ বাঁধুক। মধু সে কোথা থেকে আন্‌বে সে তা নিজেই জানে।

বিমলা বলিল, কিন্তু দীপক, পুষ্প ত তোমাকে এ কথা বলে নি যে, সে বিয়ে করছে বলেই আমাদের কাছ থেকে সে ছুটি চায়!

দীপক বলিল, সে কথা বল্‌বার মেয়ে সে নয়। সে কোনও দিনই এমন কথা বলবে না। সে ত' চায়ই আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে।—কিন্তু কেন থাক্‌বে? কেন সাধ করে' দারিদ্র্যের মধ্যে তাদের এই সুখ ভরা জীবনটা নিঃশেষ করে দেবে?

বিমলা বলিল, তা' হলেও এ সময়ে আর তার কাছে এ কথাগুলো না বল্‌লেই পারতে।

দীপক বলিল, ওকে বলব না ত কাকে বল্‌ব? ✓আজ যদি ওর বিবাহ-বাসর হোত তা হলেও লোকের মাঝখান থেকে ওকে টেনে এনে আমি আমার কথা বল্‌তাম। ওকে আমি সব জিনিষ থেকে মুক্তি দিতে রাজী আছি, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের যে এ বন্ধন তা থেকে ওকে কিছুতেই মুক্তি দেব না।✓

বিমলা পুষ্পর দিক টানিয়া বলিল, সে মুক্তিও ত সে তোমার কাছে চায় নি!

দীপক একবার নিজের মাথাটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, আমি এও জানি, পুষ্প নিজে থেকে এক দিন এ বন্ধন কেটে ফেল্‌বে। তখন আর তাকে আমি বাধা দেব না। সংসারের প্রীতি, পরিবারের স্বার্থ, নিজের জিনিষের মায়া—এ যে গৃহস্থের পক্ষে বড় আবশ্যকীয় জিনিষ। তার সংসার তার কাছে বড় হবে না—আমি বল্‌ব তার চাইতে বাইরের এ কাজগুলো বড় হোক্!

বিমলা গোলমালে পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, তবে তুমি ওকে কি বলে' এলে?

দীপক বলিয়া যাইতে লাগিল, আমি বলে এলাম, কানু আর ময়নার ওপর সেই পোড়া-বস্তীর সকল ভার দিয়ে বিদায় নিয়ে এলাম। তারা এখন নিজেদের দেখুক।

আর কি বল্লে?

দীপক বলিল, না, শুধু এই খবরটাই দিয়ে এলাম ওদের।

বিমলা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তাই ভাল! আমি ত এতক্ষণ ভেবে অস্থির!

দীপক অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, হ্যাঁ তাই ভাল। নিজে যে যা' ভাল বোঝে সে তাই করুক—তাই ভাল।

বিমলা এবার সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শুনে পুষ্প কি বলল?

দীপক নিশ্চিন্ত ভাবে বলিল, মনে হোল যেন একটু রেগেছে। আমাকে বল্‌লে, আপনার ত কোনও কিছুতেই একটা নিষ্ঠা নেই। ওদের ছেড়ে দিয়ে এলেন, এ আপনারই মত কাজ হয়েছে।—এতে আর আমি কি বল্‌ব বল ত বড়-বৌদি?

বিমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, তা' সে বল্‌তে পারে।

দীপক হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল, বলিল, কেন বলবে?

বিমলা চোখ টিপিয়া বলিল, ও জানে তোমার কাছে ওর মতামতের অনেকখানি মূল্য আছে।

দীপক বার দুই ঘরের ভিতর পায়চারী করিয়া বলিল, কিন্তু ওকে আজ দেখ্‌লাম বড় ম্লান।

বিমলা বলিল, বোধ হয় অনেক দিন পরে দেখ্‌লে বলে'।

দীপক কি একটা ভাবিয়া বলিল, হ্যাঁ অনেক দিন পরেই বটে,—না বৌদি? ... কিন্তু ধীরু-দা ওকে খুব ভালবাসে।

কল্যাণ বলিল, এর মধ্যে ও কথা এল কি করে?

দীপক নিরুপায়ের মত বৌদির মুখের পানে তাকাইতেই বিমলা কল্যাণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমাদের মনে একটা ভাবনা ছিল কিনা যে, ধীরু যদি পুষ্পকে সে মর্য্যাদা না দেয়।

কল্যাণ বলিল, সে ভাবনা' কি এখনও নেই? ধীরুর জীবনের কোন্ টুকুর ওপর নির্ভর করে আজ তোমরা এ কথা ভাব্‌ছ আমাকে বল্‌তে পার?

বিমলা বলিল, অস্থিরতাটা ওর স্বভাব নয়। ধীরেন কোনও দিন কারুর কাছে কিছু পায় নি বলেই ও নিজেকে সকলের কাছ থেকে চিরকাল বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। প্রথম বাঁধা পড়ল ও দীপকের সহানুভূতির বাঁধনে। সেই দিন থেকে ও নিজেকে একেবারে ছেড়ে দিলে। ওর ভিতরকার সেই চির-তৃষিত দস্যু লুঠ্ শেষ করে চাইছিল একখানি শান্ত নীড়—একটু ছোট স্নেহের স্পর্শ, মানুষের একটু সঙ্গ।

দীপক কি ভাবিতেছিল, কথাটা হঠাৎ থামিয়া যাওয়াতে অপ্রস্তুত ভাবে বলিয়া বসিল, এঁ্যা—হ্যাঁ তাই। তারপর নিজেকে গুছাইয়া লইয়া বলিতে লাগিল, ধীরু-দার সব আছে, কিন্তু থেকেও নেই। শৈশব থেকে কেবল তাড়া খেয়েছে—সব দিক্ থেকে কেবল একটা নির্দ্দয় অবহেলা। ও তাই বনে বনে লোকালয়ের বাইরে হিংস্র পশুর মত দিন কাটিয়েছে। তাই আশা হয় পুষ্পর স্নেহ-কোমল হৃদয়ের সহানুভূতি ও প্রীতি পেলে ওর মত ভাল গৃহস্থ কেউ হবে না।

এমন সময় সুষমা আসিয়া বলিল, এবার তোমরা নাইতে যাও দেখি সব? ও বেলা আবার তাড়াতাড়ি করে' সব যেতে হবে।

সভা ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। সুষমা ও বিমলা ভিতর বাড়ীতে চলিয়া গেল।

দীপক জুতা জামা খুলিতেছিল, কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সেই মালী আর মালীর মেয়েকে মনে আছে?

দীপক চুপ করিয়া রহিল, এক এক করিয়া যেন সব ভাবিয়া লইতেছে এমনই একটা ভাব। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়িল, বলিয়া উঠিল, মালী কি এখনও বেঁচে আছে?

কল্যাণ বলিল, আমি শেষবার যখন ওদিক ঘুরে আসি তখন একবার তোমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। শূন্য অন্ধকার বাড়ী। মালীটা জ্বর কাশীতে ভুগ্‌ছে—কোনও মতে যেন কাকে দেখবার আশায় তখনও প্রাণটুকু ধরে

আছে। আমাকে দেখেই সে কেঁদে উঠ্‌ল। বল্‌লে, আমাদের খোকাবাবু একবার এদিক পানে আর আস্‌বেন না দাদাবাবু? আমি যে সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে যেতে চাই! দীপক, তোমাদের ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীটা আজ গাছে গাছে অন্ধকার—সূর্য্যের আলো তাতে পৌঁছুতে পারে না। সন্ধ্যার বহু পূর্ব্ব হতেই ঝিঁঝির অক্লান্ত ঝিল্লীরব সুরু হয়—মাঝে মাঝে ত্রস্ত পাখীর পাখার ঝাপটে গাছের ডাল পালা নড়ে ওঠে। দিনের বেলা পর্য্যন্ত ও বাড়ীতে ঢুকতে এখন ভয় করে। আটচালা ভেঙে পড়ে গেছে, শুধু ভিটেটুকু আজও জেগে আছে, ভিতর-বাড়ীর ঘরগুলির মধ্যে শুধু বড় টিনের ঘরখানা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, আরগুলি সব মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া যেন এত কঠিন!

দীপক বলিল, একবার যাবো সেখানে। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

কল্যাণ বলিল, যেতে আর আমার আপত্তি কি? তবে তত দিন মালীটা বেঁচে থাক্‌লে হয়।—কিন্তু এখ্‌নি ত আর যেতে পারছ না।

দীপক একটু অস্থির হইয়া উঠিল। পুরাতন সেই বাড়ীটির সকল স্মৃতি আজ তাহার চিত্তলোকে হঠাৎ জাগিয়া উঠিল সেই কতকাল আগে সব ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহার পর আর যাওয়া হয় নাই। দীপক খুঁটিয়া খুঁটিয়া কল্যাণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, মা রোজ সকাল বেলা যে ঘরখানিতে বসে পূজা করতেন, সে পূজার ঘরখানা আছে দেখ্‌লে?

কল্যাণ একটু করুণ হাসিয়া বলিল, না নাই।

দীপক যেন নিজের মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল—রোজ সকাল বেলা উঠে পূজার ফুল তুলেছি, তারপর ঐ পূজার ঘরখানিকে রোজ কত রকমে ফুল দিয়ে পাতা দিয়ে সাজিয়েছি, ধূপ-ধূনো জেলে দিয়ে তার মাঝখানে চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকতে কি ভালই লাগ্‌ত! মা আস্‌তেন স্নান করে ধীরে ধীরে সেই ঘরে—তখন তাঁর কি অপরূপ রূপ! কি উজ্জ্বল জ্যোতিতে সে মুখখানা উদ্ভাসিত—মনে মনে ভাবতাম, ঠিক্ এ রকম করে' না এলে দেবতার সম্মুখে আসা যায় না।

কল্যাণ বলিল, গাছও অনেক মরে' গেছে। তোমাদের বাড়ীর উত্তর দিকের সেই ছোট পুকুরটা প্রায়-বুজে এসেছে। তার পাড়ে সেই কালীবাড়ীর বাঁধান ঘাটটা আজ ভেঙে পুকুরের মধ্যে ঝুলে পড়েছে। কালীবাড়ীর বুড়ো পূজারী বামুনটি মারা গেছেন। তাঁর ছেলেরা এখন পূজা করে। বাগানের বড় বড় আম কাঁটাল গাছগুলো অনেক ঝড়ে ভেঙে পড়ে গেছে। নারকেল গাছগুলো প্রায়ই নেই। যে কয়টা আছে তাও পোকায় ধরেছে—লিচু গাছগুলোর গোড়ার মাটি ধুয়ে সরে গেছে, শিকড় জেগে উঠেছে—ফল নাকি আর ধরে না। জামরুল, গোলাপজাম, কামরাঙা গাছগুলোর একটা আধটা এখনও খাড়া হয়ে আছে।

দীপক যেন শৈশবের গল্পের কোন্ পরীস্থানের কথা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ কল্যাণ থামিয়া যাওয়াতে জিজ্ঞাসা করিল, পাড়ার সব লোক-জনেরা—তাঁরা সব আছেন ত?

কল্যাণ নিরাশভাবে উত্তর করিল, কিছু নাই দীপক, কেউ নাই। সব ফাঁকা! অনেক ভিটেতে ঘর পর্য্যন্ত নাই। এখনও এক-আধজন যাঁরা আছেন, আজ তাঁদের দেখে আর চিন্‌তে পারবে না। তাঁদের জীবনে, পরিবারে, সংসারে যেন কোনও রস নেই—বেঁচে থাকার মধ্যেও যেন কোন প্রলোভন নেই।

দীপক উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, পাড়ার ছেলেরা আজ আর কেউ সেখানে নেই, না?

কল্যাণ বলিল, না, কেউ নাই।

হঠাৎ দীপক জিজ্ঞাসা করিল, কল্যাণ-মামা, তুমি কি আর গৃহবাসী হবে না?

কল্যাণ ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, হঠাৎ এ কথা?

দীপক বলিল, একটু কারণ আছে। তুমি থাক্‌বে বাড়ীতে? আমরা যদি সবাই বলি, তুমি থাক্‌বে না?

কল্যাণ দীপকের দুটি হাত ধরিয়া বলিল, দীপক এর চাইতে মানুষের আর বড় সুখ কি হতে পারে? যেখানে মানুষ আমাকে চেয়েছে, সেখানেই আমি গৃহ-রচনা করেছি। আজ যদি এই বাড়ীতে আমার স্থান থাকে, তাহলে নিশ্চয় থাক্‌ব এখানে।

দীপক হাসিয়া বলিল, তুমি বয়সে আমার বড় হলেও আমি তোমার মামা, জান? এ বাড়ীতে স্থান তোমার চিরকালই ছিল, তুমি নিজে অভিমান করে একদিন এ বাড়ী ছেড়ে চলে’ গিয়েছিলে। মনে আছে?

কল্যাণ বলিল, গিয়েছিলাম, আর সে যাওয়ার ভিতর আমার ব্যথাও ছিল যথেষ্ট।

দীপক স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, তা’ জানি। কিন্তু আর তুমি যেও না, এবার থাক। দিদির মন এবং শরীরের অবস্থা খুব ভাল নয়।

কল্যাণ বলিল, তুমি এত বোঝ দীপক, তবু তুমি এমন কেন?

দীপক একটু মৃদু হাসিয়া নিজের মস্তকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, মাথার পোকা।—তা থাক্। আমার জন্ত ভেবে কিছু লাভ নেই। আমি নিজে ভেবে কিছু করে উঠ্‌তে পারি নি।—তবে আসল কথা বলি, তুমি এই স্কুলটা আর পোড়া-বস্তীটা একটু দেখো। আমি একবার সেখানে যাব।

কল্যাণ বলিল, কোথায়?

দীপক উত্তর করিল, আমাদের সেই পুরোণ বাড়ীটায়। শুধু সেখানে শৈশবের স্মৃতি জড়ান আছে বলে’ নয়, ঐখানে ঐ মাটিতে আমার জীবনের সব সার্থকতা, সব সমাপ্তি জড়িয়ে রয়েছে; পদে পদে, এটুকু জীবনের সকল অবস্থায় ঐ লক্ষ্মীছাড়া বাড়ীটা আমাকে পিছু ডেকেছে। যাই নি—ফিরে তাকাই নি। কিন্তু আর সে ডাক ফেরান যায় না। কল্যাণ, পৃথিবীর সব ডাক ফেরান যায়, কিন্তু মরণের মুখে যখন মানুষ ডাকে তখন তা’ ফেরান যায় না। মানুষের কাছ থেকে মানুষ যখন চলে যায়, এতদিনের বন্ধুর কাছে তখন যেতে হয়—এ তার বিদায় অভিনন্দন।—এখন না গেলে মালীকে আর দেখ্‌তে পাব না।

কল্যাণ বলিল, এখনি ত আর যাওয়া হয় না। পুষ্পদের বিয়ে ক’দিন পরেই। তুমি না থাক্‌লে তারা যে ব্যথা পাবে।

দীপক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, ব্যথা পাওয়াটাও মানুষের একটা বিলাস। সত্যিকার ব্যথা ক’টা মানুষ পায়? ক’টা মানুষ তা’ গায়ে মেখে নেয়?

কল্যাণ তবুও বলিল, কিন্তু পুষ্প যে ব্যথা পাবে এ কথাটা ত ঠিক্?

দীপক বলিল, সে তুমি ভেবো না। তা’ ঐ প্রথম আলিঙ্গনের নিবিড় আনন্দে চাপা পড়ে যাবে।

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি তোমার কাল যাওয়াই ঠিক্?

দীপক বলিল, আজকের মত ত ঠিক্।

—ক্রমশ

"তোমার ঐ ঝরণাতলার নির্জ্জনে—"

শ্রীরাধারাণী দত্ত

শ্রান্ত-তনু ক্লান্ত-মন অবসাদে অবসন্ন দীন,
ম্লান-অধরের তলে মৌন-ব্যথা সান্ত্বনাবিহীন !
নয়নের ঘন কৃষ্ণ-পক্ষ্ম-নীড় ত্যজি' দৃষ্টি-পাখী
উড়ে যেতে চাহে শূন্যে—কোন্ সুদূরে একাকী !
মর্ম্ম-কারাকক্ষে কোন্ বন্দিনীর নিরুদ্ধ-ক্রন্দন
গুমরি' গুমরি' ওঠে—'ওগো খোল খোল এ বন্ধন !'
—আমি সেই সকরুণ ক্ষণে—
তোমার আঁখির তীরে ধীরে এসে বসি নিরজনে।

নৃত্য করে ষড়ঋতু ছন্দভরা বসুন্ধরা ঘিরি',
রজনী প্রভাতলক্ষ্মী আনাগোনা করে ফিরি ফিরি !
বক্ষ-পিঞ্জরের মাঝে প্রাণ-পক্ষী ঝাপ্‌টায় পাখা,—
দাও মুক্তি—দাও মুক্তি—খুলে দাও ঘেরাটোপ ঢাকা !
বিশুষ্ক হৃদয়-নদী মরু-পথে হারায়েছে বারি,
জীবন করিছে ধূ ধূ—তপ্ত শুষ্ক বালুকা বিস্তারি' !
—তব দিঠি-ঝরণার নীরে
সর্ব্বাঙ্গ শীতল করি' প্রাণ-পাত্র ভরে লই ক্ষীরে !

হে মোর অন্তরলক্ষ্মি ! জীবনের লীলা-স্বপ্ন দিয়া
তোমারে রচেছি মর্ম্মে—কত দুঃখ সুখ নিঙাড়িয়া !
নীলাভ-নয়নে তব ঝরিছে যে স্নিগ্ধ প্রেম-ধারা—
ও উৎসে উৎসর্গি দিনু আপনারে। জীবনের কারা
আপনি টুটিছে আজি—পাষাণ গলেছে আঁখিজলে,
প্রেম-রবিকর-রশ্মি পড়িয়াছে প্রাণ-পদ্ম-দলে।
হে মর্ম্মের সুকল্যাণী নারি !
জন্ম-জন্ম তব নীরে যেন ফিরে আসিবারে পারি।

ডাক-পিওন

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পিয়ারফুটি গ্রামে ডাক-ঘর না হইলে দশ বারোখানা গ্রামের কষ্টের আর অবধি থাকিত না। প্রয়োজনটা গভর্ণমেণ্ট নিজেই বুঝিয়াছিলেন ; গ্রামের লোককে ইহার জন্ত কোন প্রকার বেগ পাইতে হয় নাই।

পোষ্টাপিসটি চোদ্দ বছরের।

জয়রামের চাক্‌রিও প্রায় তত দিনেরই।

প্রথম প্রথম দু'চারজন নূতন পোষ্ট-মাষ্টার আসিয়াছিল বটে, কিন্তু অক্ষয় চক্কোত্তি আসিয়া অবধি অক্ষয় হইয়াই আছেন।

বুড়ার না আছে স্ত্রী, না আছে পুত্র, না আছে কন্যা—। বিবাহও করেন নাই—বোঝাও বাড়ে নাই। দিব্যি নির্ঝঞ্ঝাট নিরীহ নিঃসঙ্গ মানুষটি গ্রামপ্রান্তে আম-বাগানের ছায়া-ঘেরা নিভৃত নিরালা ডাক-ঘরের সেই এতটুকু 'ফেমিলি কোয়ার্টারে' দিনের পর দিন তাহার একটানা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

একটানাই হোক আর একঘেয়েই হোক—

চক্কোত্তি-মশাই থাকেন ভাল।

আগে নিজেই রান্না করিতেন, আজকাল একটা লোক রাখিয়াছেন।

দুপুরে ডাক-ঘরের কাজ যখন চলে, আশ-পাশের কত গ্রাম হইতে কত লোক আসিয়া জড়ো হয়। চক্কোত্তি-মশাই কাজ করেন আর একবার করিয়া মুখ তুলিয়া তাকান।

—'কি হে রামাই যে! ভাই-পো'টির না অসুখ করেছিল,—কেমন আছে?

—'তোমার কি ভাই? চারখানা পোষ্টকার্ড? বসো বাবা, একটুখানি বসো—

—'লক্ষীকান্ত যে অনেক দিন পরে? কেমন সব? ভাল ত?

—'কাজের কি আর কামাই আছে দাদা, পোষ্টাপিসের কাজ, একটি পয়সা এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

—'ডাক্‌টা বিদেয় করে' দাও বাবা জয়রাম! বিহারী অনেকক্ষণ ধ'রে বসে' আছে।'

বিহারী 'রানার' তাহার ঘুঙুর বাঁধা বল্লমটি নামাইয়া রাখিয়া জানালার কাছে বসিয়া শালের পাতা পুড়াইয়া তামাক খাবার আগুন করিতেছিল। ঘরের এক কোণে বসিয়া জয়রাম তখন চিঠির উপর ছাপ মারিতেছে। বলিল, 'এই যে, হয়ে গেছে।'

বাহিরে কয়েকজন লোক তখন 'মণিঅর্ডার' করিবার জন্ত একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছে। চক্কোত্তি-মশাই হেঁট মুখে কলম চালাইতে চালাইতে মুখ না তুলিয়াই তাহাদের বুঝাইতেছিলেন, 'আর একটুখানি আগে আসতে হয় বাবা, আজ ত' ডাক ওই বেরিয়ে যাচ্ছে—আজ আর হবে না,—বুঝলি? কাল আসিস্।'

তাহারা কিন্তু ছাড়িবে না, চক্কোত্তিকে তাহারা চেনে, ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'না দাদাবাবু, আজই হোক্।' বলিয়া টাকাকড়িগুলা তাহার হাতের কাছে আগাইয়া দেয়।

বার বার নিষেধ করিলেও লোকগুলা শোনে না।

জয়রাম এবার সত্যই চটিয়া ওঠে। ডাকের থলির ভিতর চিঠিপত্রগুলা পুরিয়া মণিঅর্ডার ও রেজেষ্ট্রীর জন্ত তখনও পর্য্যন্ত থলির মুখটা সে বন্ধ করিয়া শিল-মোহর লাগাইতে পায় নাই। বলিল, 'বললে কথা শোনো না কেন বল দেখি? বলছি হয়ে গেছে—আজ আর হবে না। যাও

এখান থেকে সরে' দাঁড়াও, ভিড় করো না—অন্ধকার হচ্ছে।'

জয়রামের উপর কি একটা অভদ্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া একটা লোক চলিয়া গেল।

জয়রাম সহজে রাগে না,—রাগিলে আর নিস্তার নাই। মুখ চোখের সে এক অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজাটা নিজেই সে তাহাদের মুখের উপরেই বন্ধ করিয়া দিতে যাইতেছিল।

অক্ষয় নিষেধ করিলেন, 'থাক্ থাক্ … আহা কতদূর থেকে এসেছে বাবা বন্ধ করিস্‌নে—থাক্! নিয়ে রেখে দিই, কাল পাঠালেই হবে।'

মুখে আর কোনও কথা না বলিয়া নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া জয়রাম আবার তাহার জায়গায় গিয়া বসিল।

লোকজন সব একে একে বিদায় হইয়া গেলে চক্কোত্তি-মশাই জয়রামের গম্ভীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'রাগ করেছিস জয়রাম?'

'কেন?'—বলিয়া জয়রাম ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'কই না।'

মিথ্যা কথা।

চক্কোত্তি-মশাই একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাড়ীর সব খবর ভাল ত?'

'বাড়ী?' বলিয়া জয়রাম কিয়ৎক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ—ভাল।'

কিন্তু ভাল যে নয় তাহা তিনি জানেন।

জয়রাম উঠিল। কেমন যেন একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, 'তোমার কি দাদা, না আছে—'

চক্কোত্তি-মশাই কথাটা তাহাকে শেষ করিতে দিলেন না, ব্যাপারটাকে তরল করিয়া দিবার জন্য হাসিয়া বলিলেন, 'হিংসে হয়?'

জয়রাম কোনও জবাব না দিয়াই বাহির হইয়া গেল।

হিংসা করিয়া লাভ নাই, কিন্তু সে যে তাহার চেয়ে সুখে আছে, পরমানন্দে বাস করিতে হইলে যে ওই বুড়া অক্ষয়ের মত বন্ধনহীন জীবন যাপন করিতে হয়, সে কথা সে কতদিন কত রকম করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছে।

•

কিন্তু সে ভুলও তাহার এক দিন ভাঙিল।

প্রথম প্রথম দেখা যাইত, পোষ্টাপিসের কাজকর্ম শেষ করিয়া অক্ষয় হয়ত আম-বাগানের ভিতর আপন মনেই পায়চারি করিতেছেন, কিম্বা হয়ত দূরের ওই শাল-বনের ভিতর পথ খুঁজিয়া বেড়ান, কোনোদিন-বা পাহাড়ের নীচে বিশ্বনাথের মন্দির-চত্বরে একাকী বসিয়া পিয়ারপুট গ্রামখানির পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকেন; দিনান্তের সূর্য্যরশ্মি মন্দির-চূড়া হইতে পাহাড়ের গা বাহিয়া বনান্তরালে গিয়া রাঙা হইয়া ওঠে, সারি সারি ভেড়া ছাগল ও গরুর পাল বন হইতে বাহির হইয়া গ্রামের পথে প্রচুর ধূলা উড়াইয়া মন্থর গতিতে চলিতে থাকে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামিয়া আসে।

তাঁহারও জীবনের সন্ধ্যা নামিতে আর দেরী নাই …

শীতের শেষে হাঁপানির টান যেন একটুখানি বাড়ে।

অতদূর পথ তখন আর তিনি হাঁটিতে পারেন না,—ডাক-ঘরের ছোট্ট চতুঃসীমাটুকুর মধ্যেই তখন তাঁহাকে আবদ্ধ থাকিতে হয়; মুখে তখনও উদ্বেগের এতটুকু চিহ্ন দেখা যায় না, অতি প্রত্যূষে বাগানের একটি গাছের তলায় গিয়া বসেন।

নব-সূর্য্যের রাঙা আলো উদয়াচল হইতে সর্ব্ব প্রথম যেন তাঁহারই অভিবাদন গ্রহণ করে!

কাজকর্ম্ম সারিয়া বৈকালে ভাবেন হয়ত' একটুখানি দূরে চলিয়া যাইবেন, কিন্তু বাগানটি পার হইতে না হইতেই হাঁপের টানে তাঁহাকে বসিয়া পড়িতে হয়। যাওয়া আর তাঁহার হইয়া ওঠে না।

পাখীদের নীড়ে ফিরিবার সময়। অপরাহ্নের স্বর্ণরশ্মি সায়াহ্নের অন্ধকারে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

অদূরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে গ্রাম্য কুটীরে সন্ধ্যা-প্রদীপের আলো ফুটিয়া ওঠে। কর্ম্মক্লান্ত দিবাবসানে ধরিত্রীর জীবজগৎ হইতে সুগভীর একটি প্রার্থনার ছন্দ যেন ক্রমাগত ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে।

কিন্তু অক্ষয়ের মনে হয়—চারিদিক হইতে কেমন যেন

একটা ভয়াবহ স্তব্ধতা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিবার জন্য নিঃশব্দ চরণে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে।

চিরজীবনের নিদারুণ বঞ্চনার ইতিহাস অন্যের অগোচর থাকিলেও নিজে তিনি বেশ ভাল করিয়াই জানেন। তাই যেন আজ তাঁহাকে এই আনন্দ-মেখলা ধরণীর সুস্নিগ্ধ বক্ষ হইতে দূরে—বহু দূরে সরাইয়া দিয়াছে;—তাই আজ এই বিদায়-বেলায় নিস্তব্ধ নির্জ্জন প্রান্তরের প্রান্তে শুষ্ক রুক্ষ মাটি আঁকড়াইয়া এতটুকু নির্ম্মল বায়ুর জন্য তাঁহাকে এমন করিয়া আছাড়ি-পাছাড়ি খাইতে হয়—বুকের ভেতরটা এমন করিয়া আলোড়িত হইতে থাকে!

বৃদ্ধের সকরুণ দুইটি চোখের দৃষ্টি মনে হয় যেন সুমুখে তাহার অখণ্ড অন্ধকারের পর্দ্দাটা চিরিয়া চিরিয়া কাহাকে যেন খুঁজিয়া বেড়ায়!

কয়েকটা বৃক্ষের অন্তরালে ডাক-ঘরের আলকাতরা-মাখানো দেওয়ালগুলা খাড়া দাঁড়াইয়া থাকে।

মসীকৃষ্ণ অন্ধকার ক্রমশ যেন আরও গাঢ় হইয়া ওঠে।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন ব্যাধিটা যতই খারাপের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, অক্ষয়ের বন্ধনহীন জীবন ততই যেন বাঁধন খুঁজিয়া ফেরে।

ডাক আসিবামাত্র জয়রামকে জিজ্ঞাসা করেন, 'চিঠি-পত্র কিছু আছে আমার নামে?'

ঘাড় নাড়িয়া জয়রাম বলে, 'না।—চিঠি? তোমার নামে চিঠি কে দেবে?'

অক্ষয় একটুখানি থামিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন, 'কেউ দেবে না,—না?'

জয়রাম হেঁট মুখে ডাকের চিঠিগুলা গ্রামের দূরত্ব অনুসারে পরের পর সাজাইতে সুরু করে। কথাটার কোনও জবাব দেয় না।—'বাহ্ বারিদপুরের চিঠি আজ একখানিও নেই!'

বারিদপুর সেখান হইতে প্রায় চার-পাঁচ ক্রোশ দূরে। সে গ্রামের চিঠি থাকিলে জয়রামের ফিরিতে সেদিন রাত্রি হয়।

চক্কোত্তি-মশাই বলিলেন, 'আমারই ভাইঝি,—বুঝলি জয়রাম, আমারই ছোট ভাই, তারই মেয়ে। বাপ মলো, তা আবার এমনি কপাল, সঙ্গে সঙ্গে মাকেও কি মরতে হয়? মেয়েটাকে মামার বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। আজকাল—তা প্রায় তের-চোদ্দ বছরের হবে বই-কি। মামা তার এমনি চিঠিপত্র কত লেখে, কিন্তু যেচে চিঠি দিলাম—তাই বুঝি আর জবাব দিলে না। লিখলাম, উমাকে তুমি আমার কাছে দিয়ে যাও, বিয়ে-থা যদি পারি ত' এইখান থেকেই দেব।' এই বলিয়া একটা ঢোঁক্ গিলিয়া অক্ষয় আবার বলিলেন, 'আমার আর বেশিদিন নেই … তাই বলি মরবার সময় … এই যে হরলাল যে! কি খবর?'

হরলালের আগমনে কথাটা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। মণিঅর্ডারের একটি কাগজ ও গোটাকতক টাকা চৌকাঠের কাছে সে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'আজ্ঞে এই টাকা ক'টি …'

অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই আবার টাকা কাকে পাঠাচ্ছিস হরলাল?'

'আজ্ঞে' বলিয়া হরলাল একটুখানি সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, 'বৌ সেই কবে বাপের বাড়ী গেছে—আরও কি তার সেখানে বসে' থাকলে চলে দাদাবাবু?'

চক্কোত্তি-মশাই-এর কণ্ঠস্বর কেমন যেন সরস হইয়া উঠিল। রসিকতা করিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'না না তা চলবে কেন, তাই কি আর চলে!—দাও বাবা জয়রাম, দাও ওর মণিঅর্ডারটি করে' দাও আগে।'

ডাক-ঘরের প্রায় সব কাজই আজকাল জয়রামকে করিতে হয়।

এক একদিন এমন হয় যে, দড়ির সেই ছোট্ট খাটিয়াটি ছাড়িয়া উঠিবার সঙ্গতি অক্ষয়ের থাকে না, বালিসে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়।

মুখ ফিরাইয়া জয়রাম জিজ্ঞাসা করে, 'বাড়লো নাকি?'

প্রাণপণে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া অক্ষয় উঠিয়া বসেন, মুখের উপর সকরুণ একটুখানি হাসির রেখা ফুটিয়া ওঠে; বলেন, 'এর আর বাড়া কমা কি জয়রাম? হয়ত এই শেষ। এবার হয়ত ছুটি নিলাম।—কিন্তু চিঠির জবাবটা কি … আজকার চিঠিগুলো দেখলি ত' ভাল করে'?'

বলিয়াই তিনি ঘাড় ফিরাইয়া মুখ গুঁজড়াইয়া আবার

তাঁহার সেই ছোট্ট চার-কোণা বালিসটির উপর লুটাইয়া পড়েন। মেরুদণ্ড হইতে পা পর্য্যন্ত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, বুকের পাঁজরাগুলা ওঠা-নামা করে।

বুড়া তাহার এই অন্তিমকালে কি যে চায়, অবলম্বনহীন অন্ধকারে কি যে সে হাত্‌ড়াইয়া ফেরে, জয়রাম তাহার কতকটা যেন বুঝিতে পারে।

চিঠিগুলা সরাইয়া রাখিয়া জয়রাম উঠিয়া দাঁড়ায়। ভিতরের দিকে উঠানের রৌদ্রে প্রকাণ্ড একটা লোহার হামান্‌দিস্তায় ধুতুরার কতকগুলা শুক্‌নো ফুল, ডাঁটি ও পাতা গুঁড়া করিয়া কাল সে শুকাইতে দিয়াছিল; তাহাই সে একমুঠা আনিয়া কলিকার উপর চড়াইয়া আগুন ধরাইয়া দেয়; অক্ষয়কে বলে, 'নাও, টানো একবার! হাঁপ যদি কমে একটুখানি।'

তামাক টানিবার মত হাত দুইটা একত্রিত করিয়া ধুতুরার ধোঁয়া খানিকটা মুখের ভিতর টানিয়া লইতেই অক্ষয় অনেকখানি সুস্থ বোধ করিতে থাকেন, বলেন, 'এ আর কতক্ষণ!'

বলিয়াই একটুখানি থামিয়া আর-একবার ধোঁয়াটা টানিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'তুই খেয়ে এসেছিস জয়রাম?'

জয়রাম হাসে। বলে, 'বৌ-এর জ্বর।'

'জ্বর!' বলিয়াই একটুখানি থামিয়া বার কতক নিশ্বাস বন্ধ করিয়া চোখ বুজিয়া অক্ষয় বলেন, 'ছি ছি, সুখ কি কোথাও নেই রে?'

সুখ!

এই সুখের কথাটা জয়রাম অনেকদিন ভাবিয়াছে! ভাবিয়াছে এই অক্ষয়ের কথা,—বন্ধনহীন মুক্ত স্বাধীন জীবন, সহজ অথচ সুন্দর,—কিন্তু অতৃপ্তির কালো একটা মেঘের ছায়া সে সেখানেও ঘনাইয়া উঠিতে দেখিয়াছে।

অক্ষয় বলিলেন, 'যা তুই, যাহোক্ কিছু চারটি খেয়ে আয় জয়রাম!'

'আর তুমি?'

অক্ষয় হাসিলেন। বলিলেন, 'আমি? আমার ভার তুই নিবি জয়রাম?'

জয়রাম মুখ নীচু করিয়া কাজ করিতেছিল, কোনও কথা না বলিয়া মুখ সে তেমনি নীচু করিয়াই রহিল, এবং সেই নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে ছোট সে ডাক-ঘরটির মধ্যে কেমন যেন একটা অবাঞ্ছিত নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

অক্ষয় কথা কহিলেন। দিব্য সহজ কণ্ঠে বলিলেন, 'ওঠ্ জয়রাম। আমি আজ আর কিছু খাব না। রাঁধুনীটাকে ও বেলায় আসতে বলেছি … খেলেই ত' আবার দেখেচিস্ ত' কেমন হয়।'

জয়রাম উঠিল।

বাড়ী ফিরিয়া দেখে, নীরু-বৌ তাহার কপালে একটা লাল রঙের গামছা বাঁধিয়া ঘরের দাওয়ার নীচে আধখানা খাটিয়া রোদের দিকে এবং বাকি আধখানা ছায়ায় রাখিয়া তাহারই উপর বেহুঁস্ অবস্থায় শুইয়া আছে। ছোট মেয়েটাকে কাছে দেখিতে না পাইয়া জয়রাম একবার এদিক-ওদিক তাকাইল। দেখে, মেয়েটা তাহার মাটির উপর হামাগুড়ি দিয়া এক-গা ধূলা মাখিয়া আপন মনেই খেলা করিবার জন্ত খাটের নীচে গিয়া ঢুকিয়াছে।—চালার উপর জলন্ত উনানে ভাতের হাঁড়ি চড়ানো। বুঝা গেল, জ্বর-গায়েই উনানটা কোনোরকমে ধরাইয়া হাঁড়িটা চড়াইয়া দিয়া নীরু-বৌ খাটে গিয়া পড়িয়াছে,—আর উঠিতে পারে নাই।

জয়রাম তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিল—ঠিক যেন আগুন!

'সুখ দিতে ত' আস নি, এসেছ কষ্ট দিতে।'

গোঁ গোঁ করিয়া নীরু-বৌ পাশ ফিরিল। কথাটা শুনিতে পাইলে আর রক্ষা ছিল না।

জয়রাম ধীরে ধীরে গিয়া রান্নায় বসিল।

তাড়াতাড়ি যা হোক চারটি রাঁধিয়া বাড়িয়া খাইতে বসিয়াছে—এমন সময় নীরু-বৌএর চীৎকার!

এ চীৎকার তাহার নূতন নয়; জ্বরজ্বালা হইলে সে এমনি করিয়াই চেঁচায়। পাড়ার লোককে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে।

কিন্তু তাহার চীৎকার শুনিয়া মেয়েটা তখন আঁৎকিয়া

উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়া খাটের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াই কান্না!

জয়রাম ব্রাহ্মণ মানুষ। খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আর উঠিবার জো নাই। সেইখান হইতেই বসিয়া তাহার দিকে বাঁ হাতটা বাড়াইয়া দিয়া দুইটি আঙুলে চুট্‌কি দিতে দিতে মুখে নানা প্রকার শব্দ করিয়া বলিতে লাগিল, 'আয় আয় বৈঁকি আয় আয়—ভাত খাবি আয়! এই ত্থাখ্‌ এইদিক পানে … এই ত্থাখ্‌—হেই!'

মেয়ে না শুনুক্‌ মা শুনিল। নীরু-বৌ তেমনি চীৎকার করিতে করিতেই খাট হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত বাড়াইল, এবং মেয়েটাকে চড়্‌ চড়্‌ করিয়া টানিতে টানিতে খাটে তুলিয়া একেবারে তাহার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিল।

জয়রাম জিজ্ঞাসা করিল, 'কি গো, আজ তোমার ওষুধ আনব ত?'

ঔষধের নামটা শুনিবামাত্র নীরু-বৌ হঠাৎ তাহার পূর্ণ চৈতন্ত ফিরিয়া পাইল কি না কে জানে, আরক্ত চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত করিয়া ঘন ঘন মাথা নাড়িতে নাড়িতে অন্ততপক্ষে পাঁচবার না না করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওষুধ? আমরণ! বল্‌ছি কতক্ষণ থেকে—মাথায় আমার এক কলসি জল ঢেলে দাও, ঠাণ্ডা হোক! তা দেবে না। ওষুধ আনবার বেলা খুব! ওষুধ আমি খাই কখনও,—খিরিস্তানের জল!'

বলিয়াই আবার সে তাহার মাথার যন্ত্রণায় চেঁচাইতে চেঁচাইতে অন্তমনস্ক হইয়া পড়িল।

পোষ্টাপিসে জয়রামের তখনও অনেক কাজ। চিঠিগুলি বিলি করিতে হইবে, অক্ষয়ের রান্না করিবার জন্ত গ্রামের যে ছোক্‌রাটিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহার কাছেও একবার যাওয়া উচিত।

খাওয়া শেষ হইলে হেঁসেল তুলিয়া দিয়া এঁটো বাসন মাজিয়া জয়রাম আবার যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইল। নীরু-বৌ-এর কাছে গিয়া গায়ে হাত দিয়া বলিল, 'ওষুধ তা'হলে আনব না?'

নীরু-বৌ আবার তাহার গামছা-বাঁধা মাথাটা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, 'না না না না, ক'বার বলব?'

বৈঁকি তখন পরম নিশ্চিন্তে মা'র বুকের তলায় লুকাইয়া মাই টানিতেছে। জয়রাম বলিল, 'ওগো দুধটা ওকে আর খাইয়ো না, বুঝ্‌লে?'

নীরু-বৌ সে কথার কোনও জবাব দিল না।

এবার সে সত্যই চলিয়া যাইতেছিল। বৌ ডাকিল, 'শোনো!'

জয়রাম ফিরিয়া দাঁড়াইতেই নীরু-বৌ তাহার মাথাটা এপাশ-ওপাশ করিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'দেব না? বেশ লোক যা হোক্‌! দাও—তোমার পায়ে পড়ি—দাও একবার মাথাটা টিপে!'

জয়রাম পোষ্টাপিসে গিয়া দেখে, অক্ষয় উঠিয়া বসিয়াছেন।

বলিলেন, 'চিঠিগুলো ত' সব এর-ওর হাতে দিলাম পাঠিয়ে,—বাকি শুধু ওই ক'খানা। খাওয়া হলো?'

'হলো!'—বলিয়া চিঠিগুলি হাতে লইয়া জয়রাম বাহির হইয়া গেল।

ভিন্ন গ্রামের চিঠি মাত্র তিনখানি, বাকি পাঁচখানি পিয়ারস্থুটির।

জমিদারের কাছারির চিঠি আছে দু'খানি। কাছারি বেশী দূরে নয়। জয়রাম সর্ব্বপ্রথম সেইখানেই গিয়া ঢুকিল।

ক্রোশ চার-পাঁচ দূরের একখানি গ্রামে জমিদারের বাস। মস্ত জমিদার। এ অঞ্চলের লোক তাঁহাদেরই কল্যাণে সর্ব্বপ্রথম হাওয়া গাড়ী দেখিয়াছে। বুড়া জমিদারের মৃত্যুর পর সম্প্রতি যিনি জমিদার হইয়াছেন—তিনি ছেলেমানুষ, বয়স প্রায় পঁচিশের কাছাকাছি, নাম সুরেন্দ্রনাথ। জমিদারী পরিদর্শনের জন্ত বোধ করি এ গ্রামে তিনি শুভাগমন করিয়াছেন। চিঠি তাঁহারই নামে।

পাড়াগাঁয়ের কাছারি। জমিদারের একজন গোমস্তা বৎসরের প্রায় সব সময়েই এখানে উপস্থিত থাকেন। জয়রাম দেখিল, কাছারিতে সেদিন বিস্তর লোকের আমদানি হইয়াছে। জমিদারের শুভাগমন বার্ত্তা তাহারা পাইয়াছে নিশ্চয়ই।

কাছারির খড়ো চালার নীচে কেরোসিন কাঠের

একখানি টেবিল একটি চেয়ার পাতা হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ টেবিলের উপর পা দুইটি তুলিয়া দিয়া চেয়ারে কাৎ হইয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সিগারেট টানিতেছিল। জয়রাম ধীরে ধীরে আগাইয়া গিয়া টেবিলের উপর চিঠি দু'খানি নামাইয়া দিয়া হাতজোড় করিয়া একটি নমস্কার করিল।

সুরেন্দ্রনাথ একবার চিঠির দিকে একবার আগন্তুকের মুখের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ কেমন যেন একটুখানি চঞ্চল হইয়া উঠিল। টেবিল হইতে পা দুইটি নামাইয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'তোমারই নাম জয়রাম—না ?'

অদূরে চৌকাঠের কাছে গোমস্তা দাঁড়াইয়া ছিল, জয়রাম জবাব দিবার পূর্ব্বেই সে বলিয়া উঠিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ,—যাক্ আর কোটাল পাঠাতে হলো না।'

সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, 'জয়রাম আচার্য্য আপনারই নাম ?'

হাত দুইটি আর-একবার কপালে ঠেকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া জয়রাম বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

সুরেন্দ্রকে জয়রাম কোনোদিন স্বচক্ষে দেখে নাই। এ গ্রামে বোধ করি ইহাই তাহার প্রথম আগমন। কিন্তু বড় রাজাবাবু বর্ত্তমানে এই সুরেন্দ্রনাথই একবার বিলাত যাইতে চাহিয়াছিল, এবং সে অশাস্ত্রীয় ব্যাপারটা লইয়া প্রজাদের মধ্যে এককালে গোলমাল এবং বাদ-প্রতিবাদও প্রচুর হইয়া গেছে, অর্থসাহায্যও করিতে হইয়াছে বিস্তর। জয়রামকে দিতে হইয়াছিল পাঁচ টাকা। সে কথা সে আজও ভুলে নাই। শেষ পর্য্যন্ত কি কারণে জানি না বিলাত যাওয়া তাহার বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু এই ব্যাপারের পর সুরেন্দ্রনাথকে চিনিতে আর কাহারও বাকি নাই, বিদ্যাশিক্ষার জন্য একাকী কালাপানি পার হইয়া যে ছেলে বিলাত যাইতে চায়, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশ্বাসও তেমনি অগাধ।

জয়রাম একদৃষ্টে সুরেন্দ্রনাথের মুখের পানে তাকাইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ চোখ হইতে তাহার সোনার চশমাটি খুলিয়া রুমাল দিয়া কাঁচ দুইটি মুছিতে মুছিতে বলিল, 'বসুন!'

জয়রাম দাঁড়াইয়া রহিল, বলিল, 'না বাবা, কাজ আছে আমার। বসব না—কি বলবে বল।'

'আপনি' হইতে জয়রাম হঠাৎ 'তুমি' বলিয়া বসিল। চোখ-মুখের চেহারা দেখিয়া মনে হইল সুরেন্দ্রনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। বলিল,—'ওই যে পাহাড়ের গায়ে মন্দির—ওই মন্দিরের পূজোরী—কে ?—তুমিই ত' ?'

জয়রাম বলিল, 'হাঁ, আমিই।'

'চোত্ মাসে গাজনের দিনে যে মেলা বসে, তার আয় বুঝি তুমিই আদায় কর ?'

জয়রাম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হাঁ।'

'ঠাকুরের জমি জায়গায়ও কিছু আছে। না ?'

'আছে।'

'সেও ত' তুমিই দখল কর ?'

'হ্যাঁ, আমিই করি।'

সুরেন্দ্রনাথ চশমাটি তাহার চোখে তুলিয়া লইয়া বলিল, 'দেবত্রের কাগজপত্র কিছু আছে ?—দেখাতে পার ?'

ঘাড় নাড়িয়া জয়রাম এবার তাহার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিল। বলিল, 'কাগজ ? কাগজপত্র— কই না,—আমরা আজ ' বলিয়া চোখ বুজিয়া জয়রাম একবার কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'তা—অনেক পুরুষ ধরেই ত … কাগজপত্র যদি কিছু থাকে ত রাজবাড়ীতেই আছে।'

'রাজবাড়ীতে ? আমার ঘরে ?' সুরেন্দ্রনাথ একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'পাগল ! আমার ঘরে থাকতে যাবে কেন ? ভোগ-দখল করছ তুমি আর কাগজ আছে আমার ঘরে ?—যা আছে তা যদি দেখাই তোমাকে … কাশীনাথ !'

গোমস্তার নাম—কাশীনাথ। ডাকিবামাত্র কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুরেন্দ্র বলিল, 'শুনেছ ? জয়রাম কি বলে—শুনেছ ত ?'

বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল, 'সেট্‌ল্‌মেন্টের কাগজ আর সেই পুরনো দলিলখানা দেখাও একবার ওঁকে—দেখিয়ে দাও !'

কথাগুলো জয়রামের কাছে কেমন যেন হেঁয়ালির মত ঠেকিতেছিল। বলিল, 'তাহ'লে কি বলতে চাও—আমার নয় ওসব ?'

গম্ভীর মুখে বারকতক ঘাড় নাড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিল, না—না।'

বলিয়াই একটুখানি থামিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, 'পুজো করতে চাও—করো, মাইনে পাবে। বাকি সব আমার। ও জমিও তোমার না, ও মেলাও তোমার নয়।'

জয়রামের মাথার ভিতরটা কেমন যেন গোলমাল হইয়া গেল। এ নিদারুণ সংবাদে গোলমাল হইবারই কথা। বলিল, 'না না, না না, তুমি জানো না বাবা, তুমি ছেলেমানুষ ... সে সব তোমার বাবা জানতেন—তোমার বাপ-ঠাকুর্দ্দা ... তুমি জানো না—কিচ্ছু জানো না।'

সুরেন্দ্রনাথ আবার একবার হাসিল। বলিল, 'জানি, জানি। ... বাপ-ঠাকুর্দ্দা এখন নেই, সুতরাং যে আছে তার কথা—বুঝলে, জানতে হবে। বুঝেছ ?'

জয়রাম প্রতিবাদ করিল না। চিঠি কয়খানি দেখাইয়া বলিল, 'রাণীমহল যেতে হবে,—আজ আসি আমি।'

বলিয়াই সে পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

সুরেন্দ্রনাথ বলিল, 'যাও, কিন্তু মনে থাকে যেন।'

—ক্রমশ

মন্বন্তর

শ্রীমতী চামেলীপ্রভা ঘোষ

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর মর্ম্মে পশেছে ভাই,
বাসনা-কামনা বহুদিন হতে পুড়িয়া হয়েছে ছাই।
উঠিয়াছে হাহাকার,
শান্তি লভেছে বিদায় যে কবে সুপ্তি ফেরে নি আর,
বুভুক্ষু হিয়া ভিক্ষা ভুলেছে হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে ;
ভিক্ষুক আজি সকলেই হেথা, ভিক্ষা কে দেয় কারে।
পিশাচেরা করে খেলা ;
পথঘাট আজি শূন্য পড়িয়া, নাই পথিকের মেলা।
অশ্রুর সাথে শুকাইয়া গেছে দীঘি, নালা, নদ-নদী ;
দোকান ফেলিয়া দোকানী গিয়াছে, শূন্য পড়িয়া গদী।
মন-ভরা মরুভূমি ;
সেথা এতটুকু তৃষ্ণার বারি খুঁজিয়া পাবে না তুমি।
শোকে শোকে সখি শুকাইয়া গেছে প্রাণখোলা হাসি হাসা
হৃদয় পুড়িয়া ছাই হয়ে গেছে ভুলিয়াছি ভালোবাসা।